রশীদ জামীল
পাগলের মাথা খারাপ পাগলের মাথা
খারাপ পাগলের মাথা
পাগলের
মাথা
খারাপ

প্রকাশকের কথা

আমরা শুধু সমালোচনাই করে গেলাম। বকওয়াসবাজদের লাইনে আনা এবং নিজেদের তৈরি করা—দুটির একটি কাজও করতে চাইলাম না। বিভিন্ন সময় এরা উলটা-পালটা বকলো আমরা শুধু মিছিলই করলাম। তাদেরকে আরও পপুলারিটি পাইয়ে দিলাম।

তবে আশাবাদী হবার মতো চমৎকার একটা অবস্থা এখন তৈরি হয়ে গেছে। আলিম লেখকদের অনেকেই লেখালেখিতে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন। নতুনরাও এগোচ্ছে। তাদের পাশে দাঁড়ালে জাফর ইকবালদের নিয়ে আর ভাবতে হবে না। প্রতিবাদেরও দরকার হবে না। বিস্মৃতদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। যেমন তসলিমা নাসরিন।

আমরা যদি কথার জবাব কথা দিয়ে এবং লেখার জবাব লেখা দিয়ে দিতে শিখে যাই, তাহলে আবার আমরা ফিরে পাব সেই জায়গা—একদা যেটা আমাদের ছিল।

সময় নষ্ট করার মতো সময় আর নেই।

শুরু হোক সুন্দরের পথচলা।

বইটি প্রকাশের সাথে সাথেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘদিন নতুন মুদ্রণ করা হয়নি। প্রয়োজনীয় কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে পুনরায় প্রকাশ করা হলো।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
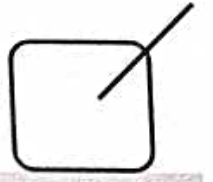
ভূমিকা

কেউ যদি বিজ্ঞান নিয়ে একটা বই লিখে আর বইয়ের নাম দেয় *ভূতের বাচ্চা আইনস্টাইন*! কেউ যদি দর্শন নিয়ে বই লিখে আর নাম দেয় *হনুমানের বাচ্চা সক্রেটিস*! অবশ্যই সেটা অ্যাক্সেপ্টেবল না। কারণ, নামগুলো স্ব স্ব ক্ষেত্রে একেকটি ব্র্যান্ড হয়ে গেছে।

কোনো পণ্ডিত যদি রাজনীতি নিয়ে বই লিখে বইয়ের নাম দিয়ে দেয় *...র বাচ্চা জিয়া*, তাহলে ভাঙা কোমর নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও বিএনপির লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করবে। আর কোনো কারণে এবং অকারণেই *..র বাচ্চা শেখ মুজিব* নাম দিলে তো আর হয়েছেই। লেখকের চৌদ্দগোষ্ঠীর খবর আছে।

নামে কিছুই যায় আসে না আবার অনেক কিছুই যায় আসে। তাই যে যুক্তিতে ভূতের বাচ্চা আইনস্টাইন/ সক্রেটিস/ জিয়া/মুজিব বলা অমার্জনীয় ধৃষ্টতা হবে, সেই যুক্তিতে; বরং তারচেয়েও শক্তিশালী যুক্তিতে *ভূতের বাচ্চা সোলায়মান* বলাটাও অমার্জনীয় ধৃষ্টতার শামিল... *পাগলের মাথা খারাপ* বইটি এই প্রেক্ষাপটেই রচিত।

সূচি

নামকরণ

বইয়ের নাম ঠিক করেছিলাম ভূতের *বাচ্চা মীরজাফর*। ভেবে দেখলাম নামটি কঠিনভাবে ডাইভার্ট হয়ে যেতে পারে। তারপর ভাবলাম নাম দিই *ছাগলের বাচ্চা হনুমান*। এই নামটিও অ্যাটাকিং মনে হলো। বইয়ের নাম হিশেবে ঠিক পারফেক্ট না। শেষমেশ নাম ঠিক করা হলো *পাগলের মাথা খারাপ*। নামটি আমার পছন্দ হয়েছে।

২.

'পাগলের মাথা খারাপ'—মানে কী! পাগলের কি আবার মাথা ঠিক থাকে নাকি? মাথা খারাপ বলেই তো সে পাগল! শুরুতেই মাথা খারাপ করে লাভ নেই। আপাতত বেইসিক পার্থক্যটা জেনে রাখা যাক। সব মাথাখারাপই পাগল; কিন্তু সব পাগলের মাথা খারাপ থাকে না।

৩.

এখানে 'পাগল' বলতে বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে মিন করা হয়নি। কেউ কারও সাথে মিলিয়ে ফেললে অথবা সংশ্লিষ্ট কারও সাথে গুলিয়ে ফেললে লেখকের কিছু করার নেই। পাগলের মাথা খারাপে পাগল বিশেষ কেউ না, আবার তাঁরা সকলেই—যারা পাগলামি করেন।

৪.

পাগলের মাথা খারাপ বইটি ডক্টর জাফর ইকবালের বিতর্কিত নামকরণে দূষিত বই ভূতের *বাচ্চা সোলায়মান*'র প্রেক্ষাপটে রচিত। কিন্তু এটাও ভাবার দরকার নাই যে, এটি জাফর ইকবালের বইয়ের কাউন্টার হিশেবে লেখা। বিতর্কিত বই ভূতের *বাচ্চায়* জবাব দেওয়ার মতো আপত্তিকর তেমন কিছু আমার চোখে পড়েনি। সমস্যা হলো নামে। সেদিকটাই আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে।

৫.

বৃক্ষ তোমার নাম কী? বিষে পরিচয়!

নামের নামতা যদি সাত্ত্বিক সমতায়
হয়ে যায় ভৌতিক ধারাপাত,
ভেসে যাবে ফেঁসে যাবে শুনো উসকানিজীবী,
ভেঙে যাবে সবগুলো বিষদাঁত।

বঞ্চিত স্বাধীনতা

'**এবং আমি যুদ্ধে যাব**। এবার আমি যুদ্ধে যাব। যুদ্ধে আমি যাবই। যোদ্ধা আমি হবই। একদম পাক্কা...'। প্রস্তুতি সম্পন্ন। লেফট-রাইট কমপ্লিট। নজরুল, রবিদা আর হাবিব—তিন কবির কাব্য-নির্যাস থেকে মনে মনে স্বাযুসং পর্যন্ত আবিষ্কার করে ফেললেন তিনি—

লাথি মার ভাঙরে চাবি
যত সব হাবিজাবি যেতায় পাবি দে মাড়িয়ে।
আমি কি আর কারেও ডরাই,
ভাঙতে পারি মাটির কড়াই,
আসছি আমি তার আগে সব পাক হায়েনা দে তাড়িয়ে...

হারামজাদা নাপাকের দল! স্যারের রণ-প্রস্তুতির খবর শুনেই প্যান্ট ঘিলা করে ফেলল! উনার শৌর্যত্বর সামনে দাঁড়াবার সাহস না পেয়ে সুদীর্ঘ ১৩(!) দিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারলেও আর মাত্র একটা দিন মাঠে থাকবার সাহস পেল না! থাকলে তিনি দেখিয়ে দিতেন যুদ্ধ কাহাকে বলে, উহা কত প্রকার ও কী কী! আফসোস, মাত্র ১৩ দিনের জন্য স্যারের আর যুদ্ধে যাওয়া হলো না। সরি স্যার। দেশের স্বাধীনতা আপনার রণশৈলী থেকে বঞ্চিত থেকে গেল।

টীকা

স্বাযুসং=স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগীত।
উৎসর্গ : জাফর ইকবাল স্যার
সূত্র : মুক্তিযুদ্ধের তেরো দিন
প্রকাশকাল : অমর একুশের বইমেলা ২০৪১![১]

---

১ এই অংশের শানে নুজুল যাদের বোঝার, তাঁরা ঠিকই বুঝে নিয়েছেন। যারা বুঝেননি, জাফরনামার শেষ দিকে গিয়ে তাঁরাও বুঝে যাবেন। সমস্যা নাই।

'মুহম্মদ' জাফর ইকবাল

জি, মুহম্মদ। মুহাম্মদ বা মুহাম্মাদ নয়। তিনি তাঁর নাম এভাবেই লিখেন। হ'তে আ-কার ছাড়া। প্রশ্ন করেছিলাম এ নিয়ে। স্যার! নামটি এভাবে লিখেন কেন?

কীভাবে লিখি?

হ'তে আ-কার ছাড়া।

তাহলে কীভাবে লিখব?

'মুহাম্মদ' লিখতে পারতেন।

এভাবে কেন লিখতে হবে?

কারণ স্যার, এটি আমাদের নবিজির নাম। নামটি আরবি। হ' আরবি 'হা' অক্ষরের প্রতিনিধিত্ব করছে। আরবি 'হা' অক্ষরের উপরে জবর আছে।

তিনি হাসলেন। বিভ্রান্ত হলাম আমি। 'স্যার হাসছেন কেন?'

বললেন, 'আমি তো নাম বাংলায় লিখছি।'

- তবুও। হ'তে আ-কার দিতে পারতেন।

এরপর তিনি যা শোনালেন, কিছু সময়ের জন্য আমাকে 'হা' করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। তিনি বললেন, 'বাংলায় লিখলেও জের-জবর লাগাতে হবে?'

- জি।

- লাগাতেই হবে?

আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকালাম। তিনি আবারও হাসলেন। আগের মতো রহস্যজনক হাসি। বললেন, 'আপনারা করলে ঠিক আর আমরা করলে ভুল?'

- বুঝলাম না স্যার!

- নবিজির নাম তো মুহাম্মাদ। মুহাম্মাদের হা'তে যেমন জবর আছে, 'মিমেও তো জবর আছে। তাহলে আপনিও তো বললেন, 'মুহাম্মদ'! তার মানে, মিমের জবর বা ম'র আ-কার আপনিও ছাড়লেন। আপনারা ম'র আ-কার ছাড়লে সমস্যা না হলে আমার হ'য়ে সমস্যা হবে কেন!!

কঠিন জবাব।

ডক্টর মুহম্মদ জাফর ইকবাল। সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। বেশ কয়েকবার আমার সুযোগ হয়েছিল তাঁর সাথে সরাসরি বসার। একবার লেখক বশির আহমদ জুয়েলকে নিয়ে, আরেকবার ছড়াকার তাজুল ইসলাম বাঙালি ছিলেন। আজ শুধু প্রথম দিনের গল্প বলছি।

প্রথম মোলাকাত

আদর্শিক মেরুকরণে জাফর ইকবালের অবস্থান যদি হয় উত্তর মেরুতে, আমি আছি দক্ষিণ মেরুতে। তবে ব্যক্তি জাফর ইকবাল আমার পছন্দের একজন মানুষ। ভালোলাগে তাঁর আচারিক সারল্য। ২০০৬ সালে তাঁর সাথে আমার প্রথম সরাসরি দেখা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ডিপার্টমেন্টে প্রথম সামনা-সামনি বসা, কথাবলা। আমার সাথে লেখক বশির আহমদ জুয়েল। আমি আমার সদ্য প্রকাশিত প্রথম বই *বিবেকের পিঠে...* গিফট করলাম তাঁকে। প্রতিভার সবটুকুন ঢেলে দিয়ে পুরো একপাতা জুড়ে আগেই অটোগ্রাফ লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। বইটি হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এর আগে এতবড় অটোগ্রাফ কেউ তাঁকে দিয়েছিল কি না! তাও স্বেচ্ছায় এবং ঘরে এনে! তিনি হাসতে হাসতে ডানে বামে মাথা দুলিয়েছিলেন।

প্রায় একঘন্টা সময় দিয়েছিলেন সেদিন। বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর আন্তরিকতায়। জীবনে প্রথম দেখা। তিনি একজন জনপ্রিয় মানুষ। আমি 'কোথাকার কেউ'-টাইপ একজন। তাও আবার উনার বিপরীত মেরুর। কিন্তু আচরণে একবারও সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।

কথাবার্তার শুরুতে আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'স্যার! একাত্তরের অনেক পরে আমার জন্ম বলে আমার পক্ষে যে রাজাকার হবার সম্ভাবনা নাই, কোনো কনফিউশন আছে?'

হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আরে কী বলেন! ধর্মকর্ম করলেই কি রাজাকার হয়ে যায় নাকি! আমার মা তো নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামাজও পড়েন। আমি হয়তো সময়ের অভাবে নামাজ-টামাজ পড়তে পারি না...'

পয়েন্ট টু বি নোটেড। **'আমি হয়তো সময়ের অভাবে নামাজ-টামাজ পড়তে পারি না।'** কথাটি আমি অনেক মাধ্যমে অনেকবার বলেছি। এই কথাটি সামনে এনে আমি বলবার চেষ্টা করেছি, জাফর ইকবালকে আর যা-ই বলা হোক; নাস্তিক বলার দরকার নেই। নাস্তিক হলে বলতেন, 'আমি নামাজ-টামাজ পড়ি না!' তিনি বললেন, 'পড়তে পারি না'। আর 'পারি না'-এর মাঝে যে 'পারা উচিত' বা স্বীকারোক্তি মিশে থাকে—এটা তো ব্যাখ্যা করে বোঝানোর কিছু নেই।

সেদিন কথায় কথায় আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'স্যার! লেখালেখির জন্য কিছু টিপস দিন তো।'

বললেন, 'আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছেন, টিপসের আর দরকার কী!'

বললাম, 'পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না স্যার।'

বললেন, 'কলমের পেছনে থাকবেন। কখনো কলমের সামনে যাবেন না।'

- মানে কী? স্যার!

- মানে হলো, যখন লিখবেন, শুধু মাথায় রাখবেন যা লিখেছি; সঠিক লিখছি কি না। বিবেকসিদ্ধ হচ্ছে কি না। ব্যস, আর কোনোদিকে তাকানো যাবে না। লিখতে গিয়ে যদি দেখা যায় নিজের কারও বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে, চলে যেতে দিতে হবে। কথা ঘোরানো যাবে না। আর বেশি বেশি পড়বেন। **যে যত ভালো পাঠক, সে তত বড় লেখক**।

সিঙারা দিয়ে লাল চা খাওয়ালেন। আমরা যখন ফিরছিলাম তখন... আগে বলা হয়নি; আমরা যখন গিয়েছিলাম, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেইক করেছিলেন। বিস্মিত হয়েছিলাম তখন। অবস্থানগত বিবেচনায় আমাদের জন্য তাঁর দাঁড়ানোর কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্টাচার ও সামাজিকতার অ্যাঙ্গেল থেকেই সেটা করেছিলেন। যখন ফিরছিলাম আমরা; তিনি আবার উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের সাথে হেঁটে হেঁটে দরজা পর্যন্ত এলেন বিদায় জানাতে।

ফেরার পথে বার বার একটি কথাই শুধু মাথায় ঘুরতে লাগল আমার।

বিদায়বেলা মেহমানকে কয়েক কদম এগিয়ে দেওয়া—এটা তো আমার নবির সুন্নাত। কিন্তু আমরা সেটা ছেড়ে দিয়েছি। ওদিকে আল্লাহপাক তাঁর নবির এই সুন্নাতকে অন্যদের মাধ্যমে জিন্দা রেখেছেন; এমনদের মাধ্যমে—যারা সুন্নতের দ্বারই ধারে না—ব্যাপারটিকে তাদের কালচারের অংশ বানিয়ে দিয়ে।

এই সেরেছে। ওলামা-হজরতগণ মনে মনে বলতে শুরু করেছেন, জাফর ইকবালের মতো মানুষ, যিনি প্রগতিশীলতার নামে আলেম-ওলামা, মসজিদ-মাদরাসা ইস্যুতে হর-হামেশা আক্রমণাত্মক, তাঁর গুণগান গাওয়া... মতলবটা কী!

মতলব পরিষ্কার। আমরা সাদাকে সাদা আর কালোকে কালোই বলব। যার যেটা প্রাপ্য, তাকে সেটা বুঝিয়ে দেবো। কারও মন্দ কথা-কাজের প্রতিবাদ করা আমাদের দায়িত্ব। ভালো'র প্রশংসা পাওয়া তাঁর অধিকার। জাফর ইকবাল কী ও কেন—সেটা নিয়ে কথা আছে। সেটা নিয়ে কথা হবে। তার মানে 'ভালো' কিছু হলেও কেন 'ভালো' বলা যাবে না!

ইনসাফের আদালতে কথা হবে মুন্সিফানা,
পৃথিবীর গতিপথ যোগ আর বিয়োগে।
শূন্য গুণন একশ' হলেও শূন্যই হয়,
ইনসাফ জিতে যাক, স্বরব্যঞ্জনের ব্যঞ্জনায়।

জাফরনামা

[স্যারের সাথে সরাসরি; এখানে বইয়ের পাতায়]

মাফ করবেন স্যার। আপনার থেকে শেখা সূত্রই অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি এখন। আপনার সাথে অনেকেই গিয়ে দেখা করে। সুতরাং আমাকে আপনি আলাদা করে মনে রাখবেন; এটা ভাবছি না। তবে আপনাকে আমি সবসময় মনে রাখি। বিশেষত আপনার শেখানো সেই সূত্রটির কারণে। 'নীতির প্রশ্নে কাউকে ছাড় দিতে নেই।' কথাটি আপনি কতটুকু মানেন, আমার সন্দেহ আছে। তবে যে আমি মেনে লিখি—আপনার যেন সন্দেহ না থাকে।

আমি জানি এই লেখাটি আপনার কাছে পৌঁছাবে এবং আপনি স্বাভাবিকভাবেই নেবেন। আমি জানি এই মানসিকতা আপনার আছে। প্রমাণ পেয়েছি আমি। আমি ভুলে যাইনি আপনাকে সমালোচনা করে আমি আমার *প্রগতির দুর্গতি* বইয়ে কয়েক পাতা লিখেছিলাম। বইটি আপনি পড়েছিলেন। তারপর, কয়েকমাস পর *সিলেট সংস্কৃত কলেজ* মাঠের বইমেলায় *অন্য প্রকাশ*'র স্টলে এক সন্ধ্যায় আপনি ঘুরতে এলেন। স্টলের তত্ত্বাবধানে ছিল সিলেটের জসিম লাইব্রেরি। আমি তখন বাইরে ছিলাম। স্টলে আমারও বই ছিল। আপনার নজরে পড়েছিল। আপনি তখন জুয়েলকে বললেন, 'ও কোথায়'? সে বলল, 'পান খেতে বাইরে গেছে স্যার'। ফোন দিই? আপনি বললেন, 'না থাক। আমি চলে যাব এক্ষুণি'। তারপর আপনি একটি বই হাতে নিয়ে সেখানে লিখলেন, 'প্রিয় রশীদ জামীলকে শুভেচ্ছা'। বইটি জুয়েলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওকে দিয়ো'।

আমি অভিভূত হয়েছিলাম স্যার। আপনাকে সমালোচনা করে লেখার পরও আপনার আন্তরিক আচরণে কিছুটা বিস্মিতও হয়েছিলাম আমি। আর কেউ হলে ভাবত, কতবড় সাহস! চুনোপুটি হয়ে আমার বিরুদ্ধে লেখালেখি করে! এই ইনস্পায়ারেশন্স থেকেই লিখছি। সাথে ছিল আপনার বাতানো সূত্র, 'কলমের পেছনে থাকা, কাউকে ছাড় না দেওয়া'। শুরু করছি স্যার, আল্লাহর নাম নিয়ে।

চাপার জোরে ভাপা ভাজি

ডক্টর মুহম্মদ জাফর ইকবাল জনপ্রিয় একজন শিশুসাহিত্যিক। সাইন্স ফিকশনকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকাকে প্রথম গণ্য করা হয়। যদিও দুষ্টজন বলে, উনার সাইন্স ফিকশনগুলো কোনো না কোনো বিদেশি বইয়ের ছায়া অবলম্বনে তৈরি। সেটা ভিন্ন কথা।

জাফর ইকবাল স্যার অত্যন্ত ঝানু মানুষ। যতই বলুন আমি একজন সাদাসিধে মানুষ। তিনি যে মোটেও সাদাসিধে নন; এ যাবতকার লেখায় সেটা বার বার প্রমাণ করেছেন। নিজেকে তিনি 'নাস্তিক' ঘোষণা করেছেন বলে আমি এখনো শুনিনি। তবে তাঁর লেখাজোখা নাস্তিকতাকেই প্রমোট করে। আর এজন্য সবচে মোক্ষম যে অস্ত্রটি তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করেন, সেটা হলো 'মুক্তিযুদ্ধ'। একাত্তরে তরুণ জাফর ইকবাল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পালিয়ে বেড়ালেও তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে ভালোই কব্জা করতে পেরেছেন তিনি।

জাফর ইকবাল তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনান। মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাতে ভালোবাসেন তিনি। তিনি যখন মুক্তিযুদ্ধের গল্প লিখেন, তখন বর্ণনাভঙ্গি থাকে এমন যে, মনে হয় যেন কেঁদে ফেলবেন। অথচ, আমরা তাঁর নিজের লেখা থেকেই জেনেছি—একাত্তরে যুদ্ধে যাননি তিনি। পালিয়ে বেড়িয়েছেন এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে। অথচ, তিনি তখন তাগড়া জোয়ান।

আমি বলছি না তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। আমি এ কথাও বলতে চাইছি না তিনি স্বাধীনতা চাননি। আমি জানি তাঁর বাবা ফয়জুর রহমানকে পাক সেনারা গুলি করে হত্যা করেছিল। সব ঠিকাছে। তবুও একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। সেই 'কিন্তু'টি নিয়ে কিঞ্চিত কথা বলি।

একাত্তর ছিল একটি অন্যরকম ভিন্ন কিছু। বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা লুঙ্গি কোমরে গুজে ছুটে বেরিয়েছিল রাইফেল হাতে। পেটে খাবার ছিল না তাদের। ছেলে কোথায়, মেয়ে কেমন আছে, স্ত্রী কোথায় থাকবে—কোনোদিকেই তাকায়নি তাঁরা। একটাই চাওয়া ছিল তাদের। দেশকে স্বাধীন করতে হবে; যে করেই হোক। পাক হানাদারদের তাড়াতে হবে; যেভাবেই হোক।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই শুরু হলো দৌড়। বাঙালি যুবকরা দৌড়ায় দেশ বাঁচাতে। তিনি দৌড়ান জান বাঁচাতে। আজ তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় বড় কথা বলেন!

জাফর স্যারের মুরিদানদের কেউ যেন এই খোড়া যুক্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা না করেন যে, 'পাক সেনারা জাফর ইকবালদের খোঁজছিল গুলি করার জন্য'। পাক সেনারা তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কোনো যুবককেই চুমো দেওয়ার জন্য খোঁজছিল না। তবুও ছেলেরা যুদ্ধে গিয়েছিল।

কেউ যেন বলবার চেষ্টা না করেন, 'তাঁর পরিবার তখন অসহায় ছিল। ভাইবোন নিয়ে তাদের অসহায় মা এখান থেকে ওখানে ছোটাছুটি করছিলেন'! একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকা কোনো পরিবারই তখন শান্তিতে ছিল না। সবাই ছিল অসহায়। অবশ্য কিছু পরিবার শান্তিতে ছিল; কিন্তু তাদের কেউ দেশে ছিল না। তারা ছিল মাসীর দেশে। তাহলে পারিবারিক অসহায়ত্বের অজুহাত ধুপে টেকে না। আর এগুলো যদি গ্রহণযোগ্য কারণ হয়, তাহলে যারা যুদ্ধে গেল, তাদের কারোই যুদ্ধে যাওয়ার দরকার ছিল না। আর সবাই যদি পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের গল্প লেখার জন্য একাত্তরে পালিয়ে বেড়াত, তাহলে কি এখন এভাবে স্বাধীন দেশে বসে জাফর ইকবালদের ভূতের *বাচ্চা সোলায়মান* লেখবার সুযোগ তৈরি হতো!

সুতরাং

প্রিয় জাফর ইকবাল স্যার!

কিছু মনে করবেন না স্যার। একাত্তরে পলায়নের জন্য আমি আপনাকে বিনীত ধিক্কার জানাতে চাই। আর আপনাকে অনুরোধ করতে চাই, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মায়াকান্না করে ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে আর বিভ্রান্ত করবেন না। কোনো পলাতকের মুখে আমরা আমাদের গৌরবের ইতিহাসকে বিবৃত হতে দেখতে চাই না। প্লিজ, থামুন এবার। আপনার মুখে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোভা পায় না। আমরা বললে সেটা বরং যুৎসই লাগে। আমি যদি বলি, একাত্তরের আগে আমার জন্ম হলে আমি হতাম মুক্তিযোদ্ধা; পৃথিবীর কারও ক্ষমতা নেই আমাকে ভুল প্রমাণ করে।

আর যদি,

এতই যদি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প করতে ভালো লাগে, তাহলে প্রতিটি গল্পের শুরুতে লিখে দিন, **'আই'ম সরি। আমি যুদ্ধে যাইনি। আমি ছিলাম পলাতক'**।

আংশিক নয়, পাঠকের অধিকার পুরোটা শোনা।

জাফর ইকবাল কি নাস্তিক

ডক্টর জাফর ইকবাল কি নাস্তিক?

তিনি কি আল্লাহ বা স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী?

জাফর ইকবালকে আমি নাস্তিক মনে করি না। এই না বলার পক্ষে অ্যাভিডেন্স আছে আমার কাছে। এখন বেজার হলেও কিচ্ছু করার নেই। আমি একই কথা বলব। কারণ—

১. আমার জ্ঞানত তিনি কখনো বলেননি 'আমি স্রষ্টা বলে কারও অস্তিত্ব বিশ্বাস করি না'।

২. তিনি তাঁর লেখায় ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করেন। ঈশ্বর শব্দ আল্লাহ শব্দের প্রতিনিধিত্ব করে কি না—সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলেই তো শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন।

৩. তাকে শাবিপ্রবির শাহপরাণ হল মসজিদে জুমুআর নামাজেও দেখা গেছে। এমন তথ্য আমি শাবি ছাত্রদের থেকেই জানি।

৪. বড়ভাই হুমায়ূন আহমেদের জানাজার নামাজে জাফর ইকবালের অংশগ্রহণ সবাই দেখেছে। নাস্তিক কেউ কারও জানাজার নামাজে শরিক হবার কথা না।

৫. জানাজার পরে উপর দিকে হাত তুলে মুনাজাত করতেও তাকে দেখা গেছে। তাহলে তাকে নাস্তিক বলা যাবে কেমন করে!

৬. জাফর ইকবালের পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিমকে একসময়; ছোট ছিল যখন, দেশে ছিল যখন—বাসায় গিয়ে কুরআন পড়াতো আমাদের এক ছোটভাই হাফিজ শফিক। কোনো নাস্তিক কি সন্তানকে কুরআন পড়ায়? সুতরাং জাফর ইকবালকে কোনো যুক্তিতেই নাস্তিক বলার কারণ নেই।

তার মানে, এই অ্যাঙ্গেল থেকে আমি কি তাঁকে 'ধোয়া তুলসির পাতা' প্রমাণ করবার চেষ্টা করছি! আমি কি তবে বলবার চেষ্টা করছি জাফর ইকবাল একজন খাঁটি দীনদার এবং পরহেজগার লোক!

মোটেও না। আর তিনিও চান না কেউ তাঁকে খাঁটি মুসলমান বলুক। এই লাইনে তাঁর আলাদা কোনো ইনটেনশন নেই। তাহলে প্রগতির বাজারে দর পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তাহলে কী?

জাফর ইকবাল কেমন?

'জাফর ইকবাল কেমন'—বলবার আগে নাস্তিক এবং নাস্তিকতা নিয়ে প্রাথমিক কিছু কথা বলা দরকার। এটা এজন্য দরকার যে, আমরা যেন শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা রাখি। অপপ্রয়োগ যেকোনো শব্দের উপযোগ কমিয়ে দেয়।

আমদের কিছু ভাই-বেরাদার নাস্তিক শব্দটির যত্রতত্র প্রয়োগ করে মূল নাস্তিকদের এক প্রকারের ছাড়পত্রই দিয়ে দিচ্ছেন। নাস্তিক বলতে অ্যান্টি-ধর্ম লোকজনকে মিন করছি। শুধু বাংলাদেশেই না, দক্ষিণ এশিয়ায় নাস্তিকতার মানেই হচ্ছে ধর্মের বিরুদ্ধে কাপড়খোলা সমালোচনা। আরও স্প্যাসিফিক করে বললে ইসলামের বিরুদ্ধে যে যত জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করতে পারবে, সে তত বড় নাস্তিক। তখন তারা প্রগতিজীবীও।

ব্রেইনওয়াশ

জাফর স্যার সারাদেশে নিজস্ব কিছু শিষ্য তৈরি করে ফেলেছেন। না, আমি তাঁর পাঠক বা ভক্তকুলের কথা বলছি না। বলছি তাঁর নায়েবদের কথা। বলছি তাদের কথা, যাদের চিন্তায় তিনি তাঁর চেতনা ডাইভার্ট করে দিতে পেরেছেন। যারা এখন তাঁর মনের মতো করে কাজ করতে পারছে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রধানতম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু আমরা কি জানি মাঝেমধ্যে ওখানে কী হয়? কেমন করে ব্রেইনওয়াশ করা হয় শাহজালালের সন্তানগুলোর? খোঁজ নিয়েছি কখনো? আমরা কি জানি শাবিতে কতো সূক্ষ্মভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে যাওয়া হচ্ছে। ইসলাম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার কারণে হোক, প্রগতির মাতাল হাওয়ার কারণে হোক, অথবা আলেম সমাজের—দূরে থেকে সমালোচনা করা বা ফতওয়া দেওয়া; কিন্তু কাছে ডেকে বা কাছে যেয়ে বিভ্রান্তি দূর করার অনীহার কারণেই হোক, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম-বিরোধী যে কাজগুলো হচ্ছে; সেটা কি বাইরে থেকে কল্পনাও করা যাবে? শাবিপ্রবিতে কীভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রেইনওয়াশ করা হচ্ছে, ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

জনৈক লেকচারার ভার্সিটিতে ক্লাস নিচ্ছিলেন। কতো ক্রিটিক্যালভাবে কাজ করা হয়, সেটা বুঝবার জন্য ব্যাপারটি আলোচনায় আনতে চাইছি। ওই শিক্ষক আল্লাহ ও কুরআনের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি। তিনি বলেননি কুরআনে

ভুল বলা হয়েছে অথবা আল্লাহ ভুল বলেছেন। কিন্তু যুক্তি খাড়া করে ছাত্র-ছাত্রীদের সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ক্লাস ডিটেইলস,

- দাবি করা হয় 'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং সবচে সুন্দর।' ঠিক না?

- জি স্যার, ঠিক।

- তাহলে তো মানুষ অন্য সকল জীব থেকে শ্রেষ্ঠ?

- জি স্যার।

- সব থেকে সুন্দর?

- জি স্যার।

- শ্রেষ্ঠত্বের দাবি হচ্ছে, মানুষের সবকিছু অন্য প্রাণীদের সবকিছু থেকে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ। রাইট?

- জি স্যার, ঠিক।

- এর মানে, মানুষের হাত অন্য যেকোনো প্রাণীর হাতেরচে বেশি সুন্দর, মানুষের পা অন্য প্রাণীর পায়েরচে সুন্দর। চোখ, মুখ, নাক, কান সবকিছু অন্য জীবের চোখ, মুখ, নাক, কান থেকে সুন্দর। তবেই না মানুষ শ্রেষ্ঠ, রাইট?

- ইয়েস স্যার।

- কিন্তু মজার তত্ত্ব হচ্ছে, জীববিজ্ঞানীরা গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন, মানুষের চোখ থেকে অক্টোপাশের চোখ অনেকগুণ বেশি সুন্দর। তাহলে কী বোঝা গেল ...

কতো সূক্ষ্মভাবে কুরআনকে ছাত্রদের কাছে মিথ্যা বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে বুদ্ধিভিত্তিক প্রপাগান্ডা। এগুলোর বিরুদ্ধে মিছিল মিটিং করার কোনো মানে হয় না। এগুলোর জবাবে কুরআন-হাদিসের রেফারেন্স টেনে পুস্তক রচনা করাও অর্থহীন। কুরআনই যারা মানছে না, কুরআনের দলিল তাদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য! তাদের জবাব দিতে হবে বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে। বিজ্ঞান দিয়ে। শাবির উল্লিখিত ঘটনাটি আমাকে নিজমুখে শুনিয়েছিলেন শাবিপ্রবির গণিতের প্রফেসর ড. সাজেদুল করিম। তিনি তখন গণিতের বিভাগীয় প্রধান।

ড. সাজেদুল করিম স্যার মাঝেমধ্যে আমাকে ফোন করে ডেকে নিয়ে যেতেন। কুরআন, হাদিস এবং ইসলামের সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলতেন।

বলতেন তিনিই বেশি; আমি বসে বসে শোনতাম। শোনতাম আর ভাবতাম, ফিজিক্সে পিএইচডি করা একজন লোক ইসলামের এত ডিপ ব্যাপারগুলো কীভাবে বলতে পারছেন?

একদিন জিজ্ঞেস করেই ফেললাম। 'স্যার! আপনি ইসলামি আকিদার এত সূক্ষ্ম বিষয়গুলো কীভাবে জানেন?' তিনি বললেন, 'বেশ কয়েক বছর আগে হঠাৎ মনে হলো, পৃথিবীতে পড়ালেখা তো অনেক করলাম। অথচ, যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে আমাকে উদ্দেশ্য করে একটি গ্রন্থ দিলেন; সেখানে, সেই গ্রন্থে আল্লাহ আমাকে কী বলতে চাইলেন—সেটা তো আমার জানার দরকার ছিল। সেই আগ্রহ থেকে কুরআনুল কারিমের ট্রান্সলেশন পড়া শুরু করলাম। দেখি কিছুই বুঝি না। তাফসির সংগ্রহ করলাম। ব্যাখ্যাসহ পড়তে শুরু করলাম। 'আলিফ লাম মিম' থেকে 'ওয়ান্নাস' পর্যন্ত খুটিয়ে খুটিয়ে পড়লাম।

ব্যাপারটি আমার কাছে ক্লিয়ার হলো।

সাজেদুল করিম স্যার আমাকে বললেন, 'আসলে আমাদের ভার্সিটির ভেতরে কী হচ্ছে; বাইরে থেকে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনারা তো কিছু শুনলে রাজপথে একটা-দুইটা মিছিল করেই শেষ। কিন্তু তো সেগুলোর জবাব হচ্ছে না, যেগুলো ছাত্রছাত্রীদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

আমি কিছু বললাম না। আমি কোনো জবাব দিলাম না। আমার কাছে কোনো জবাব ছিল না। তিনি তখন আমার হাতে একটি ম্যাগাজিন তুলে দিলেন। ম্যাগাজিনটির নাম ছিল *ভয়েস অব পিস*। *ভয়েস অব পিস* মানে *শান্তির কণ্ঠ*। প্রকাশ হতো *সোসাইটি ফর সোস্যাল পিস* থেকে। সংগঠনটি তাঁর উদ্যোগে এবং তাঁর নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছিল।

তিনি আমাকে একটি আর্টিক্যাল বের করে দেখালেন এবং বললেন, 'এটি পড়বেন। এখানে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছি অক্টোপাসের চোখ থেকেও যে মানুষের চোখ বেশি সুন্দর।'

নাস্তিকতা কাকে বলে

নাস্তিক্যবাদ বা Atheism সম্বন্ধে *অক্সফোর্ড ডিকশনারি* বলছে, Disbelief or lack of belief in the existence of God or gods. অর্থাৎ, ঈশ্বর বা ঈশ্বরদের অবিশ্বাস অথবা তাদের প্রতি বিশ্বাসের অভাব।

নাস্তিক্যবাদ অন্য শব্দে নিরীশ্বরবাদ। এটি এমন একটি দর্শনের নাম, যাতে ঈশ্বর বা স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না এবং সম্পূর্ণ ভৌত এবং প্রাকৃতিক উপায়ে প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, আস্তিক্যবাদের বর্জনকেই নাস্তিক্যবাদ বলা যায়। আরও সহজ ভাষায় বললে, বিশ্বাস নয়; যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অবিশ্বাসই হলো নাস্তিক্যবাদের মূল দর্শন।

বর্তমান বিশ্বের ২.৩% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয় এবং ১১.৯% মানুষ কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করে না। তথ্যমতে, জাপানের ৬৫% মানুষ নাস্তিক অথবা ধর্মে অবিশ্বাসী। রাশিয়াতে এই সংখ্যা প্রায় ৪৮%। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে তাকালে এই সংখ্যা ৬% থেকে নিয়ে ৮৫% পর্যন্ত।

কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের মতো যেসব ধর্মে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় না, সেসব ধর্মালম্বীদেরকেও নাস্তিক হিশেবে বিবেচনা করা হয়। কিছু নাস্তিক ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দু ধর্মের দর্শন, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং প্রকৃতিবাদে বিশ্বাস করে। নাস্তিকরা কোনো বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী হয় না এবং তারা বিশেষ কোনো আচার-অনুষ্ঠানও পালন করে না। অর্থাৎ, ব্যক্তিগতভাবে যে কেউ, যেকোনো মতাদর্শে সমর্থক হতে পারে। নাস্তিকদের মিল শুধুমাত্র এক জায়গাতেই; আর তা হলো ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করা।

অতএব,

'ইসলামের দৃষ্টিতে জাফর ইকবাল একজন গোমরাহ লোক। তিনি চরম ইসলামবিদ্বেষী লেখক। তিনি মনেপ্রাণে মাদরাসা-বিদ্বেষ লালন করেন। আলেম-ওলামা এবং মসজিদ-মাদরাসা নিয়ে কটাক্ষ করার একটি সুযোগও

তিনি হাতছাড়া করেন না...' এমন সব অভিযোগ'র একটাতেও আমার আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু এক পয়েন্টে। নাস্তিকতায়। যেহেতু নাস্তিকতার সংজ্ঞায় তিনি পড়ছেন না, তাহলে জোর করে তাঁকে নাস্তিক বানানোর দরকার কী! আর কেনোইবা লোকে বলবে, 'দ্যাখো! মোল্লারা নাস্তিকতার সংজ্ঞাই জানে না!

মনে রাখা দরকার। কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, মুরতাদ, নাস্তিক—এগুলো সমার্থক নয়। কেউ কাফির বা মুশরিক হলেও জরুরি না যে, সে নাস্তিকও হবে। কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য ভাবলে সেও নাস্তিক নয়। অবিশ্বাসী হতে পারে, মুশরিক হতে পারে; কিন্তু নাস্তিক নয়। আর যে কাউকে জোর করে নাস্তিক খেতাব দেওয়ারইবা দরকার কী! তাদের জন্য ইসলাম নির্ধারিত যে খেতাব আছে, সেগুলো কি নাস্তিক থেকে খুব একটা কম? কোনো কোনোটি কি আরও বড় নয়?

কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, নাস্তিক এবং মুরতাদ পাঁচটি পরিভাষা। একটি আরেকটির সাথে বিভিন্নভাবে সহায়ক বলা যায়। সমগোত্রীয়ও বলা যায়; তবে সমার্থক নয়।

কাফির : যারা সরাসরি আল্লাহকে অস্বীকার করে। অথবা আল্লাহর বিধানাবলীকে অস্বীকার করে। যেমন, ফেরাউন, কারুন, নমরুদ, শাদ্দাদ, আবুলাহাব এবং আবু জেহেল অ্যান্ড কোম্পানি।

মুশরিক : যারা একাধিক স্রষ্টায় বিশ্বাসী। কেউ বিশ্বাস করে দ্বিত্ববাদে, যেমন ইয়াহুদি। যারা আল্লাহকে স্বীকার করার দাবি করলেও হজরত উজাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করে। কেউ বিশ্বাসী ত্রিত্ববাদে, যেমন খ্রিষ্টানরা; যারা হজরত ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র এবং হজরত মরিয়ম আ.-কে আল্লাহর স্ত্রী বিশ্বাস করে।

মুনাফিক : যারা বাহ্যিকভাবে নিজেদের মুসলমান দাবি করলেও ভেতরগতভাবে কাফির। নবিযুগের শ্রেষ্ঠ একজন মুনাফিক ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল।

মুরতাদঃ কোনো মুসলমান যখন জেনেবুঝে কুরআন-সুন্নাহের কোনো বিধান অস্বীকার করে। অথবা আল্লাহ/রাসুলকে নিয়ে ইমান-বিধ্বংসী মন্তব্য করে, তখন তার নাম হয় মুরতাদ।

আর নাস্তিক : নাস্তিক মানে যে স্রষ্টা বলে কারও অস্তিত্বই স্বীকার করে না।

নাস্তিকতা : খাঁটি-ভেজাল

গত দশক থেকে বাংলাদেশে ভেজাল নাস্তিক গজানো শুরু হয়েছে।

নাস্তিক আবার খাঁটি ভেজাল হয় নাকি!

হয়। নাস্তিক-বিশ্বের খবর রাখেন যারা, তাঁরা জানেন প্রকৃত নাস্তিক যারা, ধর্ম নিয়ে তাদের কোনো কর্ম নেই। তাঁরা অবিশ্বাস লালন করেন। অবিশ্বাসেই বিশ্বাস তাদের। যেহেতু পৃথিবীর সব ধর্মই গড়ে ওঠেছে বিশ্বাসকে ভিত্তি করে, তাই ধর্ম নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা থাকে না। তাঁরা চলেন যুক্তির তালে। যুক্তি কতটা যৌক্তিক, সেটা ভিন্ন কথা।

বাংলাদেশে যারা বক নাস্তিকতার চর্চা করেন, তাদের মূল কাজই হচ্ছে ধর্ম-বিরোধিতা। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে ইসলাম-বিরোধিতাই তাদের প্রথম এবং প্রধান নাস্তিকতা। অথচ, ইউরোপ-আমেরিকায় যারা নাস্তিকতা লালন করেন, ধর্ম তাদের টার্গেট হয় না। মাঝেমধ্যে নাস্তিকতার নামে উল্টা-পাল্টা যেগুলো ঘটে, যারা ঘটায়, সেগুলোর মূলে নাস্তিকতা নয়; অন্যকিছু। বিশেষ উদ্দেশ্য।

অতিসম্প্রতি সাতটি মুসলিম দেশ থেকে আমেরিকায় প্রবেশে হোয়াইট হাউজ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার অ্যাক্সিকিউটিভ অর্ডার জারি হবার পর আমেরিকা জুড়ে যে প্রতিবাদ হয়েছে, সেখানে নাস্তিকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। অবাক হবার মতো একটি তথ্য দিই। হোয়াইট হাউজ কর্তৃক অর্ডারটি জারি হবার পর (যা আমেরিকান আদালত কর্তৃক স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে) আমি আমার নিজ চোখে দেখেছি নিউ ইয়র্ক সিটির কেন্দ্রীয় মসজিদ মদিনা মসজিদের দরজায় নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসীদেরও দিনের পর দিন ফুল দিয়ে যেতে। এটা তাঁরা কেন করল!

মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে!

ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে!

আল্লাহর ঘরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে!

মোটেও না। এমন হলে তো তারা কালিমা পড়ে মুসলমানই হয়ে যেত। কাজটি তাঁরা করেছে তাদের মানবিক দায় থেকে। তাদের এই মানবিকতায় ভনিতা ছিল না। কারণ, প্রথম তিন/চারদিন রাতের আঁধারে ফজরের নামাজের আগে এসে মসজিদের মূল গেইটের সামনের পুরোটা জুড়ে ফুল ছিটিয়ে চলে গেছেন তাঁরা। মানুষ ফজরের নামাজ পড়তে এসে আবিষ্কার করেছে ফুলের পাপড়ি বিছানো! এমন ঘটনা যে শুধু মদিনা মসজিদেই ঘটেছে, তা না। আরও অনেক মসজিদেও এমন ঘটনার কথা শোনা গেছে। এখানেই শেষ নয়। সরাসরি মসজিদে এসে মসজিদের ইমাম এবং দায়িত্বশীলদের তাঁরা বলেছে, 'ডন্ট ওরি। আমরা আছি আপনাদের পাশে'।

বলবার চেষ্টা করছি প্রকৃত নাস্তিক যারা, তাঁরা কোনো ধর্মের পক্ষে নেই আবার বিপক্ষেও নেই। যে কারণে কখনো এবং যখন কোথাও মানুষ অমানবিকতার শিকার হয়, অথবা যখনই কোথাও মানবতা আক্রান্ত হয়, তাঁরা তখন পাশে দাঁড়ান। এর ব্যতিক্রম হলে নিশ্চিতভাবেই তাঁরা খাঁটি নাস্তিক নয়। অর্থাৎ, ভেজাল নাস্তিক।

কেউ যেন আবার এই ভেবে বিভ্রান্ত না হন যে, তাহলে আমেরিকা বা কানাডায় যে কয়েকটি মসজিদে অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া গেল...। এগুলো নাস্তিকরা করেনি। তথ্য-উপাত্তে যাদের নাম এসেছে অথবা পুলিশ যাদেরকে গ্রেফতার করেছে, তাদের কেউ নাস্তিক ছিল না! তারা কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী ছিল। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো ধর্মই ছিল না। সন্ত্রাসীর একটাই পরিচয়, তারা সন্ত্রাসী। তাদের কোনো ধর্ম থাকে না। অ্যা টেরোরিস্ট হ্যাজ নো রিলিজিওন।

তাহলে মুসলমান নামধারী কোনো সন্ত্রাসী কোথাও সন্ত্রাস করলে সেটার দায় ইসলামের উপর চাপানো হয় কেন! গোটা মুসলিম-সমাজকে এজন্য দোষ চাপানো হয় কেন—এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। এর সাথে বাস্তবতার কোনো মিল থাকতে হয় না। ঘটনা যেখানেই ঘটুক, ঘটনা যে-ই ঘটাক; মুসলমানকে যখন দোষ চাপানোর দরকার হয়, চাপানো হয়। কখনো ঘটনার পর চাপানো হয় আবার কখনো চাপানোর জন্য ঘটানো হয়।

সেক্টর কমান্ডার (শূন্য) পদে নিয়োগ

জাফর স্যাররা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন। অথচ, এদেশে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা বাণিজ্য নিয়ে খুব কিছু বলতে চান না। তাঁরা প্রকৃত রাজাকার তো বটেই, তাদের অপছন্দের কাউকে রাজাকার বানানোর একটা চান্সও ছাড়েন না, অথচ, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা যে সাম্প্রতিক সময়ে রাজাকারের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক, সেটা ভাবেন না। রাজাকার যারা, তারা তো এমনিতেই কোনঠাসা হয়ে থাকে। আত্মদহনে জ্বলতে থাকে। কিন্তু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা বুক ফুলিয়ে অপকর্ম করে বেড়ানোর সুযোগ পায়।

বাংলাদেশে অসম্ভব বলে নাকি কিছু নেই। কেউ কেউ বলেন বাংলাদেশ হলো সব সম্ভবের দেশ। মাঝে মাঝে মনে হয়, যারা এসব বলে; বাড়িয়ে বলে না। কারণ, যে দেশের খোদ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর টেবিলে ২৫ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার তালিকা পড়ে ঘুমায়, যে দেশে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র খোলা বাজারে কিনতে মিলে, যে দেশের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নিজেই নিজের নামে একখান মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র সই করে পকেটস্থ করে রাখেন, যে দেশে আমলা-কামলা, নেতা-খেতার মাঝে মুক্তিযুদ্ধের সনদ বিতরণ চলে 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে, আর প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ঘুরতে হয় দ্বারে দ্বারে, মরতে হয় ধুকে ধুকে...

এবং

নয় মাস মাসিমার দেশে বসে আয়েস করে পায়েস খাওয়া কাপুরুষরা হয়ে যায় চেতনার হর্তাকর্তা। বাপ-দাদার সমালোচনা করলে হয়ে যেতে হয় রাজাকার। মেজর জলিল, খালেদ মোশারফ, কর্নেল তাহের, মেজর জিয়া, মেজর মঞ্জুর, এ কে খোন্দকার এবং কাদের সিদ্দিকীদের মতো সেক্টর কমান্ডার/ মুক্তিযোদ্ধাদের শরীরে তকমা লাগে রাজাকারের অথবা রাষ্ট্রদ্রোহের অথবা স্বাধীনতার বিরোধিতার...

সেই দেশে খুব সহসাই যদি 'একাত্তরের সেক্টর কমান্ডার (শূন্য) পদে নিয়োগ প্রদান কেন বৈধ হবে না' মর্মে কোনো রুল-টুল জারি করিয়ে নেওয়া হয় অথবা এই মর্মে সংবিধানে বিশেষ সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করে 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত করিয়ে নেওয়া হয়—অবাক হওয়া ঠিক হবে না!

আজিব ব্যাপার হলো, জাফর স্যাররা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবার জন্য মুখিয়ে থাকলেও এসব নিয়ে মুখ খুলেন না। খুলবেনই-বা কীভাবে! তরিকা এক না!

স্যারের কাছে জিজ্ঞাসা

জাফর স্যার বা এই লাইনে আরও যারা বুজুর্গ আছেন, তাঁদের সকলের মধ্যে একটা 'সবজান্তা' ভাব বিদ্যমান। তাঁদেরটা তো তাঁরা জানেনই। ভাব দেখান আমাদেরটাও আমাদের থেকে বেশি জানেন। কারণে-অকারণে মাদরাসাশিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। প্রশ্ন তো আমরাও তুলতে পারতাম। জাফর স্যারকেই প্রশ্ন করতে পারতাম,

১. আপনি পিএইচডি করলেন ফিজিক্সে আর দায়িত্ব নিয়েছেন কমপিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের! কেনোগো স্যার! যে সাবজেক্টে উচ্চতর ডিগ্রি নিলেন, সেটাই না পড়াবেন।

২. আপনি বিজ্ঞানের মানুষ। তো বিজ্ঞান বিষয়ে আপনার মৌলিক বই কই! আপনি কেন পড়ে আছেন সাইন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞান নিয়ে!

৩. ইসলামপাড়ায় পান থেকে চুন খসলে সাথে সাথেই আপনি আপনার কীবোর্ড নিয়ে বসে যান। মুহূর্তের মধ্যে কতকিছু আবিষ্কার করে ফেলেন। ভালো। আপনি লেখক মানুষ। লিখতেই পারেন। কিন্তু পরিমলরা যখন ধর্ষণ করে, আপনি তখন মৌনব্রতি হয়ে যান! শ্যামলরা যখন উল্টা-পাল্টা করে, আপনি তখন কোথায় থাকেন!

৪. আপনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে জিহাদে লিপ্ত। আপনাদের তৈরি শিক্ষা-সিলেবাসে দেশের ছেলেমেয়েরা এক একজন মহাপণ্ডিত হয়ে বেরোবে, তেমন স্বপ্নের কথাই আপনি ফেরি করে বেড়ান। এতই আস্থা আপনার দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়, তাহলে নিজের ছেলেমেয়েকে বিদেশে পড়ালেখা করান কেন?

৫. কোনো বিষয়ে পুরোটা না জেনে কথা বলা তো অন্যায়। তাই না? আপনি ইসলাম এবং মাদরাসাশিক্ষা নিয়ে বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন। আপনি কি ইসলামের অপরিহার্য মৌলিক বিষয়গুলো

সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন? আপনি কি জানেন কোনটা ইসলাম আর কোনটা বিকৃতি? তাহলে এ নিয়ে আপনি জ্ঞান দেন কোন যুক্তিতে!

৬. আপনি যুদ্ধাপরাধের বিচার চান। কিন্তু আদালতে সাক্ষ্য দিতে যান না। একাত্তরে না-হয় যুদ্ধে গেলেন না। অবস্থা প্রতিকূল বলে। এখন তো অনুকূল ছিল। তাহলে? অন্তত নিজের বাবার জন্য হলেও কি যাওয়া উচিত ছিল না?

৭. আগস্ট দু'হাজার পনেরোতে আপনার একবার ইচ্ছা হয়েছিল গলায় দড়ি দিতে। না, মাদরাসাওলাদের কারণে নয়; নিজের ছাত্রদের কারণে। যোগাসনি হয়ে শাবির পুকুরপাড়ে বৃষ্টিতে বসে রয়েছিলেন কয়েক ঘণ্টা, মিডিয়া যাওয়ার আগ পর্যন্ত। সম্প্রতি আপনার নয়নের মণি বদরুল খাদিজা নামের মেয়েটিকে কোপানোর পর আপনার আবার নতুন করে বিষটিশ খেতে ইচ্ছে করেছিল কি না!

কিন্তু আমরা এসব প্রশ্ন তুলি না। আমরা এসব প্রশ্ন করি না। ভাবি, যার যার মাথা, তার তার বেদনা। খামাখা নাক গলানোর দরকার কী!

ভূতের বাচ্চা...

জাফর ইকবাল লিখেছেন শিশুতোষ অথবা কিশোরতোষ একটি ভৌতিক বই। নাম দিয়েছেন *ভূতের বাচ্চা সোলায়মান*। এই নামকরণ নিয়ে কঠিন আপত্তি উঠেছে সারাদেশে। বিবেকবান (অমুসলিম)রাও বলছেন, জাফর ইকবাল ভালো করেননি। এটা উসকানিমূলক। মুসলমানরা বলছেন, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই কাজটি করেছেন। উদ্দেশ্য, উসকানি দেওয়া অথবা আলোচনায় আসা।

দেখা যাক এই নামকরণ নিয়ে আপত্তির প্রশ্নটি কোন্ যুক্তিতে যৌক্তিক। কেন তাঁর ভূতেলা বইয়ের নাম সোলায়মান বলায় নবি সোলায়মানকে হেয় করার অভিযোগ উঠল। চলুন দেখি অভিযোগ সঠিক কি না! তার আগে একনজর দেখে নিই 'নাম' ব্যাপারটা আসলে কতটা কী!

নাম

ছোট্ট একটি শব্দ 'নাম'।

'নাম' কী?

'নাম' হচ্ছে বস্তু বা ব্যক্তির পরিচয়ের পাসওয়ার্ড। সবকিছুর একটা নাম থাকে। থাকতে হয়। মহান আল্লাহ তাঁর নিজের জন্যও অনেকগুলো নাম নির্ধারণ করেছেন আর বলে দিয়েছেন, বান্দা তোর যখন খুশি যে নামে খুশি আমাকে ডাক দিস। আমি আল্লাহ টুয়েন্টিফোর সেভেন প্রস্তুত আছি। আমার সব আওয়ারই পিক আওয়ার। অফপিক বলতে আমার কাছে কিছু নাই।

নামের প্রতিক্রিয়া

বস্তু বা ব্যক্তির আইডেন্টিফিকেশন ক্যারি করে একটি নাম। অবশ্য দুইপাড়ের সন্ধিক্ষণে নামটি কিছু সময়ের জন্য উহ্য হয়ে যায়। যেমন, আমার নাম রশীদ জামীল। জানি না কখন, যখন মারা যাব; কিছু সময়ের জন্য আমার নামটি আমার থেকে হাইড হয়ে যাবে। তখন আমার নাম হবে 'লাশ' বা 'ডেডবডি'। আমাকে গোসল দেওয়ানো হবে, বলা হবে, 'লাশ গোসল দেওয়ানো'। কেউ যদি দেখতে আসে, এসে বলবে না; 'দেখি, রশীদ জামীলের মুখটা দেখি'! বলবে, 'লাশের মুখটা দেখাও'। কবরের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় কেউ বলবে না, 'রশীদ জামীলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে'। বলবে, 'লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে'।

আবার এই হিডেন অবস্থাটাও স্থায়ী নয়। কবরস্থ করবার পর আমি আমার নামটি আবার ফিরে পাব। আমার নামটি আবার আমার সাথে জুড়ে দেওয়া হবে। তখন আর কেউ বলবে না, 'এটা লাশের কবর'। বলবে, 'এটা রশীদ জামীলের কবর'।

যাহোক, পৃথিবীতে বসবাস করবার জন্য একটা করে নাম থাকতে হয়। নামের সাথে জড়িয়ে যায় আবেগ-ভালোবাসা কিংবা শ্রদ্ধা। নামের মাধ্যমে ছড়িয়ে যায় ভয়-ভীতি কিংবা স্থিতি। টাচে যেতে হয় না, শুধু নামই মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। 'মীর জাফর' নামটি সামনে আসামাত্রই থু থু-তে মুখ ভরে যায়। 'রাজাকার' শব্দটি সামনে এলে অন্তর ভরে ওঠে ঘৃণায়। 'লেন্দুপ দর্জি'র নাম এলে ঘৃণার সাথে একটু করুণাও জাগে। আবার 'মুহাম্মাদ' নামটি কোনো মুসলমানের সামনে উচ্চারিত হওয়ামাত্র মন ভরে যায় ভালোবাসায়।

অনেক বস্তুর ক্ষেত্রেও নামের প্রভাব আমরা লক্ষ করি। আপনার সামনে তেতুল নিয়ে কথা হলে মুখে লালা চলে আসে। রাজশাহীর পাকা আমের গল্প বলা হলে আপনাকে দেখে মনে হয় মুখ মিটা হয়ে গেছে আপনার! নিমপাতা বা করলা নিয়ে কথা বললে আপনার মুখ হয়ে যায় বাংলা পাঁচের মতো। চেহারার কন্ডিশন দেখলে মনে হয় কেউ বুঝি আপনার মুখে আধা গ্লাস নিমের শরবত ঢেলে দিয়েছে...

নামের প্রভাব

নাম বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে। বিশেষত নাম যদি হয় আল্লাহর, তাহলে সেটার প্রভাব শুধু পৃথিবীতেই নয়; সব জগতেই সমানভাবে বিস্তৃত থাকে। আল্লাহর প্রসিদ্ধ ৯৯ গুণবাচক নাম মুখস্থ করে নিয়মিত পাঠ করার অভ্যাস করতে পারলে কেউ, আশা করা যায় আল্লাহপাক সেই লোককে আর জাহান্নামে দেবেন না।

এ যুগের মাথামোটা পণ্ডিতগণ নামের প্রভাবে বিশ্বাস করেন না। তেমন এক পণ্ডিতের সাথে মোলাকাত হয়েছিল মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর। পণ্ডিত আবার ডাক্তার ছিল। বলল, জনাব কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি?

- জি বলুন।

- বিংশ শতাব্দীতে এসেও আপনারা এখনো গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না, আপনার মতো জ্ঞানী মানুষরা পর্যন্ত। অবাক হই!

- যেমন?

- এই যেমন ধরুন, পেটব্যথা নিয়ে কেউ আমাদের কাছে এলে আমরা পেইনকিলার দিই। পেইনকিলার পেটে যায়। মিশে যায় নার্ভের সাথে। কাজ করে। ব্যথা কমে। আর আপনারা করেন কী! পেটের চামড়ায় হাত রেখে বিড়

বিড় করে কিছু একটা পড়ে ফু দেন! ব্যথা পেটের ভেতরে আর আপনারা দিচ্ছেন ফু! তাও চামড়ার বাইরে। আপনাদের ফু বাতাসের সাথে মিশে যাচ্ছে। কোন যুক্তিতে আপনাদের কাছে মনে হয় এই ফু'র কারণে পেটব্যথা কমে যাওয়া উচিত!

মাওলানা ফরিদপুরী বললেন, 'তুই কী বুঝবিরে...র বাচ্চা!' (ডট চিহ্নগুলোর স্থানে আক্ষরিক অর্থেই একটি গালি ধরে নিন।)

ডাক্তার কল্পনাও করেননি শামসুল হক ফরিদপুরীর মতো এতবড় একজন আলেম তাকে এভাবে গালি দিতে পারেন! রাগে-অপমানে চেহারা লাল হয়ে গেল তাঁর। বললেন, 'মাফ করবেন মাওলানা। আমি আপনার কাছ থেকে এটা অ্যাক্সপেক্ট করিনি! জবাব দিতে মন না চাইলে না দিতে পারতেন। কিন্তু গালি...'

থর থর করে কাঁপছিলেন ডাক্তার। কথা বলতে পারছিলেন না। মাওলানা ফরিদপুরীর মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই। তিনি স্বাভাবিকভাবেই বললেন—

- ডাক্তার সাব। বুঝলাম না, হঠাৎ করে আপনার চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল কেন!

- এতবড় গালি দিয়ে আবার বলছেন চেহারার পরিবর্তন হয়ে গেল কেন!

- তো কী হয়েছে! গালি তো একটি কথা। আমি একটি কথা বলেছি। কথাটি আমার মুখ থেকে বের হয়ে বাতাসে মিশে গিয়েছে। আপনি রাগ করবেন কেন!

- রাগ করব না মানে! গালি তো আপনি আমাকেই দিলেন!

- কিন্তু বাতাসে মিশে গেছে তো!

- তাতে কী!

মাওলানা শামসুল হক তখন বললেন, 'আমি একজন মানুষ। আমার মুখ নিঃসৃত আমার একটি কথা, কথাটি বাতাসের সাথে মিশে গেলেও তোমার চেহারার রঙ পরিবর্তন করে দিতে পারল, তোমার মাঝে এতটা প্রভাব বিস্তার করে ফেলল, তোমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলো—এটা তোমার যুক্তিতে ধরে। আর আল্লাহর নাম মুখে নিয়ে ফু দিলে সেটা যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে—এটা তোমার যুক্তিতে ধরে না?' ডাক্তার বলল, 'সরি হুজুর। এবার ধরেছে। আসলে আমাকে এর আগে কেউ এভাবে বুঝিয়ে বলেনি।'

নাম নিয়ে ন্যাকামো

নাম নিয়ে কীর্তি-কুকীর্তি দুটোই চলে সমান তালে। কোনটা বলি, কোনটা ছাড়ি। প্রথমত নাম রাখার ক্ষেত্রে বাছ-বিচার থাকে না। নাট-বল্টু-স্ক্রু ড্রাইভার—যা খুশি নাম একটা রাখলেই হলো! সন্তান বড় হবার পর নাটবল্টুতে যখন জং ধরে, তখন দৌড়ায় হুজুর অথবা সাইকিয়াটিস্টের পেছনে।

বাংলা নাটক-সিনেমায় যত অসৎ কারেক্টার আছে, সবগুলোর জন্য চয়েজ করা হয় মুসলমানি নাম। কাজের মেয়ে হলে প্রথম পছন্দ রহিমা। কাছের ছেলে হলে আবদুল। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নাটক-সিনেমা তৈরি হলে রাজাকার চরিত্রের সবগুলো নাম অবশ্যই মুসলমানি নাম হবে এবং তাদের ম্যাকাপে অতি-অবশ্যই টুপি-দাড়ি থাকবে। মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করা, 'একাত্তরে মুসলমানরাই ছিল স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি!'

আমি শুনেছি বাংলাদেশে; বিশেষত উত্তরবঙ্গের দিকে বিভিন্ন এনজিও সংস্থা নাকি তাদের দারোয়ান, আয়া এবং কাজের লোকদের নাম নির্ধারণ করছে বুখারি, আমেনা, ফাতেমা ইত্যাদি। সত্য হয়ে থাকলে ইনটেনশন পরিষ্কার। ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করা। আরেকটি কারণও থাকতে পারে। বেশ ক'বছর থেকে বাংলাদেশের আলেম-ওলামা সেবার নামে ধর্মান্তকরণের কাজে লিপ্ত এনজিওগুলোর ব্যাপারে সেভাবে কথা বলছেন না। হতে পারে তাদেরকে আবার নিজেদের দিকে টেনে নেওয়া। যত বেশি প্রতিবাদ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তত বেশি কাবিলিয়্যত এবং ততই মাল খসানোর সুযোগ।

নাম এবং অসাম্প্রদায়িকতা

বাংলাদেশে অতি প্রগতিবাজ একটি শ্রেণি আছে; কোথাও ইসলামি পরিভাষা দেখলেই যাদের শরীরে জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়। অথচ, তাঁরা তাদের নিজেদের অজান্তেই ইসলামি পরিভাষার চর্চা করে যান। যেমন—

স্বাধীনতা যুদ্ধে মৃতদের তাঁরা 'শহিদ' বলেন। অথচ, 'শহিদ' একটি খাস ইসলামি পরিভাষা। ভাষাস্মৃতি স্মারকের নাম 'শহিদ মিনার'! যুদ্ধাপরাধের বিচার হয় আদালতে। আদালত ইসলামি শব্দ। হাকিম, মুনসেফ, হুকুম, বেকসুর, খালাস, কয়েদি সবগুলোই আরবি-ফারসি অথবা ইসলামি পরিভাষা। এগুলোয় তাদের সমস্যা হয় না। এমনকি তাদের নিজেদের বাপ-মায়ের

দেওয়া নাম; আবদুল গাফফার চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির, মুনতাসির মামুন, বদর উদ্দিন উমর, আবেদ খান, জাফর ইকবাল—সবগুলো নামই আরবি এবং ইসলামি। কোথাও ইসলামি শব্দ থাকলে তাদের মাথায় গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়; অথচ, ইচ্ছায়/অনিচ্ছায় ইসলামি নাম নিয়ে ঘুরে বেড়ান তাঁরা। আমি এ পর্যন্ত একজনকেও দেখিনি ইসলামি হওয়ার কারণে নাম পাল্টে ফেলেছেন! ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আর কাকে বলে!

ভূতের বাচ্চা সোলায়মান!

আল্লাহর নবি হজরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম জগদ্বিখ্যাত একজন নবি। একজন মুসলমানের কাছে সকল নবিই মর্যাদার আসনে আসীন। সোলায়মান আলাইহিস সালাম বিশ্ববাসীর কাছে একজন প্রতিষ্ঠিত নবি। আর চোখ-কান খোলা অনুসন্ধিৎসু সকল মানুষই জানে, সোলায়মান আলাইহিস সালামের অনুসারীদের মধ্যে শুধু মানবজাতিই ছিল না, (একর্ডিং টু কুরআন) জিনরাও ছিল তাঁর অনুসারী। আর এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই, বাস্তব জিনদেরই পরাবাস্তব কথ্য বা লেখ্যরূপই হচ্ছে ভূত। সুতরাং জিন-ভূত নিয়ে লেখা কোনো বইয়ের নামে সোলায়মান নামটি ইউজ হলে এটা আর বলে দেওয়া লাগে না কোন সোলায়মান উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ বলছেন, সবকিছুর দিকে তাকাতে হবে কেন!

জবাবই-বা কেন দিতে হয়!

জবাব দিতে হয়; কারণ, সোলায়মান একজন নবি ছিলেন। আর নবিদের নিয়ে কেউ জঘন্যাচার করলে সমপর্যায়ের জবাব দেওয়া আল্লাহর শিক্ষা। হাতের কাছে থাকা উদাহরণ হচ্ছে সুরায়ে লাহাব, তাব্বাতি ইয়াদা সুরা। আবু লাহাব বলেছিল, 'মুহাম্মদ, তুমি ধ্বংস হও'। আঙুল উঁচিয়ে কথা বলেছিল সে। আল্লাহর পছন্দ হয়নি। আল্লাহ সেটা সহ্য করেননি। সাথে সাথেই জবাব দিলেন, 'তাব্বাতি ইয়াদা আবি লাহাব; আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক'।

নবিজির শিক্ষা উদারতা আর নম্রতার; কথা ঠিক। কিন্তু নবিকে গালি দেওয়ার পর আল্লাহ যেমন সহ্য করেননি, সহ্য করেননি সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিজওয়ানও। একবার এক লোক নবিজিকে ছন্দে ছন্দে গালি দিয়েছিল। নবিজি হজরত হাসসান বিন সাবিতকে সমপর্যায়ের ছন্দ তৈরি করে জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জাফর ইকবাল স্যার সাধারণ যেকোনো মানুষের নাম ব্যবহার করতে পারতেন। সে নাম মুসলমানি নাম হলেও এতটা আপত্তি উঠত না। কিন্তু তিনি ভূতের বাচ্চার মতো একটা জায়গায় একজন নবির নাম নিয়ে এসছেন। আর সেই নবিও আবার এমন নবি—জিনজাতিও ছিল যার অনুসারি। এজন্যই কথা বলতে হচ্ছে। অনুভূতির কিছু জায়গা আছে, যেখানে আপস করতে হয় না। সুযোগ নেই। কল্পনাকে চিরন্তনতার সাথে গুলিয়ে ফেলা কোনো সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন লোকের কাজ হতে পারে না—যেমনটি করেছেন তিনি। সোলায়মান নামটি ব্যবহার করায় কথা উঠেছে এবং যৌক্তিকভাবেই।

নবিসম্রাট সোলায়মান
সালতানাতে সোলায়মানি

হাওয়ায় ভাসছে সিংহাসন! পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত—ভেসে চলেছে তখতে সোলায়মানি। সাথে উড়ছে পরিন্দা। তাদের সাথে খোশগল্প করে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আল্লাহর নবি সোলায়মান। দু'মাসের দূরত্ব অতিক্রম করছেন দুই প্রহরে। মানুষ এবং জিন, পশু এবং পাখি, পিঁপড়ে পর্যন্ত দোলছে তাঁর আঙুলের ইশারায়! পৃথিবীবাসী এমন দৃশ্য এর আগে আর দেখেনি!

কুরআনে কারিমে অসংখ্য নবিদের মধ্য হতে মাত্র ২৫ জনের কথাই আমাদের জানানো হয়েছে। কারও ব্যাপারে অনেক বেশি, কারও ব্যাপারে খুব কম। আসলে আল্লাহ তো আল্লাহই। মর্জির মনশামত পৃথিবী চালান। কখনো এমন নবির গল্প শোনান; যাকে দুশমনরা করাত দিয়ে কেটে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলেছিল! কখনো এমন কারও গল্প বলেন; যিনি সাড়ে নয়শ বছর মার খেয়েছেন! কখনো এমন কারও কথা জানান; যিনি বছরের পর বছর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। এসব শুনিয়ে আল্লাহপাক আমাদেরকে মেসেজ দেন—'আমি কখন কী করি আর কেন করি; বান্দা তোরা সেটা বুঝবি না। তোরা তোদের ছোট্ট ব্রেইন খাটিয়ে বুঝে উঠতে পারবি না নবিদের নবি বিশ্বনবিকে আমি তায়েফের জমিনে কেন মার খাওয়াই। কেন তাঁকে দিনের পর দিন ক্ষুধার কষ্টে পেটে পাথর বেঁধে রাখতে হয়। অন্যদিকে সোলায়মানকে শাহেনশাহ বানিয়ে পৃথিবীব্যাপী বিরাজ করাই। কেন কী করি আমি; সেটা আমি জানি। তোরা জানিস না। জানার চেষ্টা করেও লাভ নেই। তোদেরকে আমি এত বোঝার ক্ষমতা দেইনি।'

বিশ্বনবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যূনতম দেড় হাজার বছর আগে ১০১১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জন্ম নেওয়া নবিসম্রাট সোলায়মান ছিলেন হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের ১৯ পুত্রের অন্যতম একজন। ৫৩ বছরের জিন্দেগিতে ৪০ বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন তিনি। হজরত সোলায়মান

আলাইহিস সালামের কথা কুরআনে কারিমের সাতটি সুরায় ৫৩ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ৫৩ বছরের জীবন, ৫৩ আয়াত!

নবি-সম্রাট সোলায়মানের জীবনটি আক্ষরিক অর্থেই ছিল বর্ণাঢ্য। দিনের পর দিন তাকে নিয়ে লিখে গেলেও কথা শেষ হবে না। পবিত্র কুরআনে সোলায়মান আলাইহিস সালামকে নিয়ে এত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সোলায়মান কাহিনি আলোচনা করবার জন্যে কুরআনের বাইরে না গেলেও চলে। শুধু খুঁজে খুঁজে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো তুলে ধরলেই হয়ে যায়।

সোলায়মান

হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম-তনয় সোলায়মান ছিলেন আল্লাহর অন্যতম একজন নবি এবং জগদ্‌বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট। অর্ধপৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত ছিল তাঁর শাসন। মানুষ, জিন, পশু-পাখি ছিল তাঁর অধীনে। আল্লাহপাক তাঁকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় ও নবুওয়াতের সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া তাঁকে এমন কিছু নিয়ামতও দান করেছিলেন, যা অন্য কোনো নবিকে দেওয়া হয়নি।

বাইবেলের বর্ণনা মতে, তিনি ছিলেন ইসরাইলের প্রথম এবং প্রভাবশালী রাজা। তাঁর বংশ ইয়াহুদার মাধ্যমে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পর্যন্ত গিয়ে মিলিত হয়েছে। কুরআনও বলছে, সোলায়মান ছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর। কুরআনের ভাষায়,

> 'তারপর আমি ইবরাহিমকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দিয়েছি এবং সবাইকে সত্য পথ দেখিয়েছি, (যে পথ) ইতোপূর্বে নুহকে দেখিয়েছিলাম। আর তাঁরই বংশধর থেকে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে (হেদায়াত দান করেছি)। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের তাদের সৎ কাজের বদলা দিয়ে থাকি।'[২]

সালতানাতে সোলায়মানি

হজরত সোলায়মান আলাইহিস সালামকে নিয়ে কুরআনে কারিমের বিস্তৃত বিবরণগুলো একত্র করি। চলুন ঘুরে আসি সালতানাতে সোলায়মানি।

---

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ৮৪।

আল্লাহপাক জিনকে সোলায়মান আলাইহিস সালামের অনুগত করে দিলেন। সোলায়মান আদেশ করেন, জিনরা সাগরে ডুব দিয়ে তলদেশ থেকে মণিমুক্তা, হীরে-জহরত তুলে আনে। ইমানদার জিনরা কাজ করে সওয়াবের নিয়তে। দুষ্ট জিনেরা ভয়ে। ইমারত নির্মাণ কাজে জিনরাই ছিল সোলায়মানের কলাকুশলী। জীবদ্দশায় তো বটেই, নবির মরণের পরেও কাজ করতে হয়েছিল তাদের। সেটা যথাস্থানেই আলোচনায় আসবে।

পশু-পাখি-সার্ভিস

পশু-পাখিদেরকে আল্লাহপাক সোলায়মানের অনুগত করে দিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, তিনি তাদের ভাষাও বুঝতেন। পাখিরা তাঁর হুকুমে কাজ করতো। ইসলামের ইতিহাস কিছুটা হলেও জানেন অথচ, 'হুদহুদ' পাখির নাম শুনেননি—এমন মুসলমান সারা পৃথিবীতে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। হুদহুদ ছিল সোলায়মান আলাইহিস সালামের রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের একজন কূটনীতিক। 'সাবা'র রানি বিলকিসের কাছে ঐতিহাসিক পত্রটি হুদহুদই বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। হুদহুদ নিয়ে অনেক কথা বলা দরকার। বিলকিস অধ্যায়ে বলা হবে।

সোলায়মানি সভাসদ

হজরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম প্রায়ই পশু-পাখিদের সাথে বসে শলা-পরামর্শ করতেন। একদিন সবাইকে একত্রিত করে ভালো-মন্দ খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে দেখলেন 'হুদহুদ' পাখিটি নেই। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তাঁর। তিনি তাকে ধরে আনার নির্দেশ দিলেন। অনুপস্থিতির জন্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করলেন। কুরআনের ভাষায়—

> 'সোলায়মান পক্ষীকুলের খোঁজ-খবর নিলেন। অতঃপর বললেন, কী হলো! হুদহুদকে দেখছি না যে! নাকি সে অনুপস্থিত? (সে আমার অনুমতি ছাড়া বেরিয়ে পড়েছে বলে) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেবো কিংবা মৃত্যুদণ্ড। অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ' (তাহলে ক্ষমা পেতে পারে)।[৩]

---

[৩] সুরা নমল : ২০-২২।

কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ উপস্থিত হয়ে বলল, ‘(আলমপনা!) আপনি যে বিষয়ে অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার নিকট “সাবা” থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসছি।’

সোলায়মানের সামনে সে তার রিপোর্ট পেশ করল।

সোলায়মান বাহিনী ওই সময় মরু অঞ্চল অতিক্রম করছিল। সাথে থাকা পানি ফুরিয়ে আসছিল। হুদহুদ পাখিকে আল্লাহপাক একটি বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। মাটির নিচে কোথায় কোন্ সম্পদ এবং কোথায় কত কাছে পানি আছে; সে মাটির উপর থেকেই দেখতে পেত। সোলায়মান হুদহুদকে এ জন্যেই বিশেষভাবে খোঁজ করছিলেন। মরুগর্ভে কোথায় পানি আছে; হুদহুদের মাধ্যমে জেনে নিয়ে জিনদের কাজে লাগাবেন। পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করবেন। হুদহুদ কী খবর নিয়ে এসছিল—সেটা বিলকিস পর্বে আলোচনায় আনবে।

পিপীলিকা সমাচার

পিঁপড়ে হচ্ছে অতি ক্ষুদ্রাকৃতির একটি প্রাণী। আল্লাহর নবি সোলায়মান তাদের কথাও বুঝতেন। শুধু তাই নয়, পিঁপড়েরা পর্যন্ত জানত নবিগণ কারও উপর জুলুম করেন না। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে, হজরত সোলায়মান জিন, মানুষ ও পশু-পাখির বিশাল বহর নিয়ে একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। পিপীলিকা অধ্যুষিত একটি উপত্যকায় পৌছানোর মুহূর্তে পিপীলিকা নেতা তার সাথিদের বলল—

> ‘সাথিগণ! তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবশে করো। অন্যথায় সোলায়মান ও তাঁর বাহিনী তোমাদের পিষে ফেলবে।’

কোনো পিঁপড়ে যাতে এই ভেবে বাইরে থেকে না যায় যে, আল্লাহর নবি আমাদের হত্যা করবেন—এটা বিশ্বাসযোগ্য না। এজন্য লিডার এ কথাও বলে দিলো, ‘ওয়াহুম লা ইয়াশউরুন’, তোমাদের আকৃতি এতই ছোট যে, তাদের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে তোমরা যে চেপ্টা হয়ে যাচ্ছো—এটা তাঁরা বুঝতেই পারবে না।

পিপীলিকা-লিডারের কথা শুনে সোলায়মান আলাইহিস সালাম হেসে ফেললেন। বললেন—

'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে ক্ষমতা দাও, যেন আমি তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি; যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্মাদি করতে পারি এবং তুমি আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।[৪]

এত ক্ষমতা; কিন্তু কত ক্ষমতা

একদিন সোলায়মান আলাইহিস সালাম বৈঠক করছিলেন। আলোচনা চলছিল খোলামেলা। ফুরফুরে মোডে ছিলেন আল্লাহর নবি। সেই মুহূর্তে ছোট্ট একটি পোকা সামনে এসে দাঁড়াল। নবি ভাবলেন, কিছু চাইতে এসেছে। তিনি বললেন, 'ও পোকা! জিন, ইনসান, পশু-পাখি এমনকি বাতাস পর্যন্ত আমার অনুগত। বল তোর কী লাগবে? তোদের যাবতীয় কিছুর জিম্মাদারি আমার। আর আমাকে সে ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। তুই যা চাইবি, তাই দেওয়া হবে তোকে। বলে ফেল কী চাই?'

ছোট্ট পোকা হেসে ওঠল। সোলায়মান বললেন, 'হাসছিস কেন'?

- মাফ করবেন জাহাপনা। হাসছি আপনার কথা শুনে।

- কেন! তোর বিশ্বাস হয় না?

- বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয় মালিক। প্রশ্ন ক্ষমতার।

- কী বলতে চাস তুই?

- বাদ দেন মালিক। আমি ছোট মানুষ(!) আমার চিন্তা-ভাবনাও ছোট।

- কথা ঘোরাস কেন! বল, কী লাগবে তোর। আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি।

- সত্যি দিবেন? পারবেন দিতে?

- বলেই দেখ না!

- ঠিকাছে মালিক। আল্লাহপাক আমার জন্য যে রিজিক নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে রিজিক একটু বাড়িয়ে দেন। আর সেই সাথে আমার হায়াতটাও একটু বাড়িয়ে দিয়েন...

---

[৪] সুরা নমল : ১৬-১৯।

বিস্মিত হয়ে তাকালেন সোলায়মান! এতটুকুন জন্তু হলেও অনেক ডিপ পয়েন্টে চলে গেছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তাঁর ক্ষমতা কত সীমিত। লজ্জিত হলেন আল্লাহর নবি। বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তুই এমন জিনিস চেয়েছিস আমার কাছে, যা দেওয়ার ক্ষমতা আমার আসলেই নেই।'

সোলায়মানের ছোট্ট এই পোকাটির আকিদা কত পোক্ত ছিল। সেও জানত, দেবার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। অথচ, বর্তমান বিশ্বে এমন অনেক কপালপোড়ার দেখা মিলে, যারা আল্লাহ ছাড়াও পীর-ফকির-খাজাবাবা, দয়াল বাবাদের কাছে চায়! এরা কতবেশি হতভাগা! কাফের থেকেও খারাপ অবস্থায় তারা। কাফেরের তো তাও সম্ভাবনা থাকে মরার আগে ইমান নিয়ে আসার; তাহলে সব গোনাহ মাফ হয়ে গেল। কিন্তু এই মুশরিকদের সামনে এই সম্ভাবনাও নেই। এরা তো শিরক করছে ইবাদত মনে করে। যে কারণে তাওবা করারও প্রশ্নও আসে না।

বিচারিক প্রজ্ঞা

এক লোক ফসল ফলিয়েছে। পাশের বাড়ির অন্য আরেকজন ছাগল পালন করতো। দিনের বেলা সে তার ছাগলকে নিজ তদারকিতে ঘাস খাওয়াত আর রাতে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে রাখত—যাতে বেরিয়ে গিয়ে আরেকজনের ফসলের বারোটা না বাজিয়ে ফেলে।

একদিন দরজায় তালা দিতে ভুলে গেল সে। ছাগল বেরিয়ে ফসলের অবস্থা খারাপ করে দিলো। বিচার নিয়ে দুজন গেল আল্লাহর নবি হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে। তিনি বললেন, 'এখানে ছাগলের মালিকের খামখেয়ালি আছে। অতএব, ক্ষতিপূরণ হিশেবে সে তার ছাগল ফসলের মালিককে দিয়ে দেবে।'

দাউদ আলাইহিস সালামের আদালত থেকে বেরিয়ে তাদের দেখা হলো দাউদ-তনয় সোলায়মানের সাথে। তিনি দুজনের বক্তব্য শুনে বললেন, 'এসো আমার সাথে'। আবার নিয়ে গেলেন পিতা দাউদের কাছে। বললেন—

- এই মামলায় এরচে ভালো একটা সমাধানের উপায় আমার জানা আছে।

- দাউদ বললেন, 'সেটা কেমন'?

-ছাগলের মালিক তার ছাগল ফসলের মালিকের হাওলা করে দেবে, আর জমি নিয়ে আসবে তার কব্জায়। ছাগল যে পরিমাণ ফসল নষ্ট করেছে, সে পরিমাণ

ফসল ফলাতে যেটুকুন সময় এবং শ্রম দিতে হয়, সে পরিমাণ সময় এবং শ্রম দিয়ে ফসল ফলিয়ে দেবে ছাগলের মালিক। আর এই সময় জমির মালিক ছাগলের দুধ দোহন করে পান করবে। যেদিন ফসল আগের অবস্থায় চলে আসবে, ছাগলের মালিক ছাগল ফেরত পাবে।

সুলায়মান আলাইহি সালামের সিদ্ধান্ত আল্লাহরও পছন্দ হলো। আল্লাহ জানালেন, 'ফা ফাহহাম-না-হা সুলাইমান, আমিই সোলায়মানকে সঠিক সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিয়েছিলাম'।[৫]

সাম্রাজ্যের দরখাস্ত

> 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা করো এবং এমন সাম্রাজ্য দান করো, যা আমার পরে আর কেউ যেন না পায়। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।'[৬]

হজরত সোলায়মান আলাইহিস সালামকে এমন সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, পৃথিবীতে আর কাউকে যা দেওয়া হয়নি। কারণ স্পষ্ট। অন্যরা রাজত্ব পায় আল্লাহর স্বেচ্ছানুগ্রহে আর তিনি আল্লাহর কাছ থেকে রাজত্ব চেয়ে এনেছিলেন।

কেউ যেন এই ভেবে বিভ্রান্ত না হন যে, ইসলামে নেতৃত্ব এবং শাসন-ক্ষমতা চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। তাহলে সোলায়মান রাজত্ব চাইলেন কীভাবে? তিনি নবি ছিলেন। আর নবিগণ আল্লাহর অনুমতক্রিমেই সকল কাজ করেন। সুতরাং রাজত্ব চাওয়াটাও আল্লাহর অনুমতিক্রমেই ছিল।

বিলকিস, হুদহুদ এবং সোলায়মান

সুরা নামল এবং *সুরা সাবা* সামনে রেখে রানি বিলকিস এবং সোলায়মান আলাইহিস সালামের কাহিনির সারসংক্ষেপ আলোচনা করা যাক।

শাম ও ইরাক সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ইয়ামন তথা 'সাবা' রাজ্যের রানি ছিলেন 'বিলকিস বিনতে সারাহ'। তিনি ছিলেন সাম বিন নুহ আলাইহিস সালামের ১৮ তম অধঃস্তন বংশধর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের জন্য নিয়ামতের সকল দরজা-জানালা খুলে দিয়েছিলেন। ধনে-জনে-মানে—কোনো অভাব ছিল

---

[৫] আম্বিয়া : ৮৯।
[৬] সুরা সোয়াদ : ৩৫।

না তাদের। অভাব ছিল শুধু ইমানের। ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ ভুলে গেল তারা! আল্লাহর আনুগত্য এবং উপাসনা ছেড়ে দিয়ে শুরু করল সূর্যের পূজা। একসময় প্লাবণের আজাব নেমে আসল তাদের ওপর।

শুরুর দিকে বলা হয়েছিল, নবিকে না জানিয়ে হুদহুদ গায়েব হয়ে গিয়েছিল এবং ফিরে এসে রানি বিলকিস সম্পর্কে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেছিল। কুরআনের ভাষায় হুদহুদের রিপোর্টটি ছিল এমন—

> 'আমি এক মহিলাকে সাবাবাসীর ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের নজরে তাদের কার্যাবলিকে সুশোভিত করেছে। অতঃপর তাদেরকে সত্য পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা আর সঠিক পথপ্রাপ্ত হতে পারছে না।'[৭]

হুদহুদের প্রতিবেদনটি পাঠ করার পর হজরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম সন্দেহের চোখে তাকালেন তার দিকে। হুদহুদ কি সত্য বলছে, নাকি অনুপস্থিতির জন্য বানোয়াট অজুহাত খাড়া করছে! যাচাই করা দরকার। তিনি বললেন—

> 'দাঁড়াও। আমাকে বুঝতে হবে তুমি সত্য বলছ, নাকি কাহিনি ফাঁদছ! তোমাকে আমি একটি পত্র লিখে দিচ্ছি। এটা নিয়ে তাদের কাছে যাবে। তাদের কাছে আমার চিঠিটি পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। আমি দেখতে চাই, তাঁরা কী রি-অ্যাক্ট করে!'

হুদহুদ বলল, 'ঠিকাছে মালিক। আমি আপনার চিঠি নিয়ে আবার যাব তাদের কাছে। এবং আশাকরি তারপর আপনি নিজেই জানতে পারবেন, আমি আপনার সাথে প্রতারণা করিনি। আমি আপনার নুন খাই মালিক। কী করে ভাবলেন আপনার সাথে নিমকহারামি করব'?

সোলায়মান আর কিছু বললেন না। হুদহুদ উড়াল দিলো সাবার পথে। বিলকিসের হাতে তুলে দিলো সোলায়মানের চিঠি। রানি চিঠি পেয়ে খুশি হলেন আবার কিছুটা চিন্তিতও হয়ে পড়লেন। জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রীসভার বৈঠক আহ্বান করলেন তিনি। সবাই উপস্থিত হলে সোলায়মানের দেওয়া চিঠির কথা জানিয়ে পরামর্শ চাইলেন তাদের কাছে। বললেন, 'হে সভাসদবর্গ! আমাকে

৭

একটি মহিমান্বিত পত্র দেওয়া হয়েছে'। পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইলেন বিলকিসের কাছে। 'কী লিখেছেন সোলায়মান'?

বিমর্ষ চেহারায় বিলকিস বললেন, 'আমাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, "হয় আমাকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে, আর না-হয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে।" বলা হয়েছে—"আমার মোকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো, না-হয় আমার বশ্যতা স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও"।'

চিঠির ভাষায় সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিলকিস বললেন,

'এখন আপনারা আমাকে পরার্মশ দিন। এই অবস্থায় আমি কী করতে পারি? আমাকে কী করা উচিত? আপনাদের পরামর্শ ছাড়া এককভাবে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাই না'।

তারা বলল, 'আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। আপনি চাইলে আমরা মোকাবিলার জন্য তৈরি আছি। এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। আপনি ভেবে দেখুন, আপনি আমাদের কী আদেশ করবেন!'

বিলকিস বললেন, 'আমি জানি আমাদের সৈন্যরা প্রস্তুত আছে। অর্ডার করলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু আমি ভাবছি ভিন্ন কথা। রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন সেই জনপদকে বিপর্যস্ত করে তুলে এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত লোকদের অপদস্থ করে। তাঁরাও এরূপ করবে। সুতরাং আমি কৌশলে তাদের দমানোর কথা ভাবছি। আপনারা সম্মত হলে আমি তাদের নিকট কিছু উপঢৌকন পাঠিয়ে দিই। দেখি কী জবাব আসে।'

সবাই সায় দিলো। বলল, 'এটাই ভালো হবে মনে হচ্ছে'। রানি বিলকিস উপঢৌকনের বিশাল একটি পারসেল সোলায়মানের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন।

বিলকিসের দূত উপহারের পার্সেল নিয়ে সোলায়মানের দরবারে এসে হাজির হলো। উপহার-সামগ্রী পেশ করল রাজদরবারে। সোলায়মান রেগে ওঠলেন। বললেন, 'তোমরা কি ধন-সম্পদ দ্বারা আমাকে বস করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের দেওয়া বস্তু থেকে অনেক উত্তম। ফিরে যাও। গিয়ে বলো, "আমরা আসছি। তৈরি হতে বলো"। যদিও জানি, আমাদের মোকাবিলা করার মতো শক্তি তাদের নেই। আমরা অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বের করে দেবো এবং তাঁরা লাঞ্ছিত হবে।'

উপঢৌকন ফিরিয়ে দেওয়ার পর সোলায়মান মন্ত্রীসভার মিটিং ডাকলেন। সবাইকে ডেকে বললেন, 'আমার বিশ্বাস, বিলকিসবাহিনী আমাদের কাছে এসে অবশ্যই আত্মসমর্পন করবে। আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে অবশ্যই আল্লাহর বাহিনীর কাছে মাথা নত করতে হয়। আমি চাই তাঁরা আল্লাহর কুদরতের একটু কারিশমা দেখুক। কে আছো এমন, তাঁরা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার আগেই বিলকিসের সিংহাসন এখানে নিয়ে আসতে পারবে?'

জনৈক জিন বলল, 'আমাকে সুযোগ দিন মহারাজ। আমি পারব'।

- কত সময় লাগবে তোমার?

- আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই বিলকিসের সিংহাসনকে আমি আপনার সামনে এনে হাজির করতে পারব।

- কিতাবের জ্ঞান ছিল;[৮] এমন আরেকজন বলল, 'এটা তো অনেক দীর্ঘ সময়! আমি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই সিংহাসনটি এখানে এনে উপস্থিত করতে পারব। এবং বলতে না বলতে দেখা গেল রানি বিলকিসের সিংহাসন সোলায়মান আলাইহিস সালামের সামনে! তারপরের কাহিনি বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে সুরায়ে নমলের ২৭ থেকে ৪৪ নাম্বার আয়াতে—

সোলায়মান আলাইহিস সালাম যখন বিলকিসের সিংহাসনটি সামনে দেখলেন, তখন বললেন—

> 'এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শুকরিয়া আদায় করি, নাকি অকৃতজ্ঞ হই। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই করে থাকে এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় সে জানুক যে, আমার পালনর্কতা অভাবমুক্ত ও কৃপাময়।'

তিনি নির্দেশ দিলেন সিংহাসনটির বাহ্যিক আকৃতি একটু পরিবর্তন করে ফেলতে। বললেন—

> 'সিংহাসনের আকৃতি একটু বদলে দাও। দেখি সে এসে তাঁর সিংহাসন চিনতে পারে কি না!'

---

[৮] 'কিতাবের জ্ঞান ছিল' বলে কাকে বোঝানো হয়েছে—এ বিষয়ে তাফসিরবিদগণ মতভেদ করেছেন। তার মধ্যে প্রবল মত হলো, তিনি ছিলেন স্বয়ং হজরত সোলায়মান। কেননা, আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল।

দেখা গেল আল্লাহর নবির ধারণাই ঠিক ছিল। বিলকিস তাঁর দলবল নিয়ে এসে হাজির হলো সোলায়মান আলাইহি সালামের দরবারে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—

'আপনার সিংহাসন কি দেখতে এমনই ছিল?'

সে বলল—

'এমন মানে কী! আমার তো মনে হচ্ছে এটাই হবে। অবশ্য আমার সিংহাসনকে এখানে দেখে মোটেও অবাক হচ্ছি না আমি। আমি ইতোমধ্যেই সবকিছু অবগত হয়ে গেছি এবং আমরা আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি।'

বিলকিস ইমান নিয়ে আসলেন এবং বললেন—

'হে আমার পালনকর্তা! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সোলায়মানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।'

অশ্ব কুরবানি

পিতা দাউদের ন্যায় পুত্র সোলায়মানকেও আল্লাহ বার বার পরীক্ষায় ফেলেছেন। তাঁর জীবনের এক একটি পরীক্ষা এক একটি ঘটনার জন্ম দিয়েছে। কুরআন সেগুলোর ততটুকুই আমাদের জন্য উল্লেখ করেছে, যতটুকু আমাদের উপদেশ হাসিলের জন্য প্রয়োজন। অশ্ব কুরবানির ঘটনা কুরআনের বর্ণনানুসারে—

'যখন তাঁর সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন, "আমি আমার প্রভুর স্মরণের জন্যই ঘোড়াগুলোকে মহব্বত করে থাকি। কারণ, এর দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হয়ে থাকে।" অতঃপর ঘোড়াগুলোকে গলায় ও পায়ে আদর করে হাত বুলাতে লাগলেন। অতঃপর তিনি ঘোড়াগুলোকে দৌড়িয়ে দিলেন। সেগুলি দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।'

ঘোড়া পরিদর্শনে মগ্ন হওয়ার কারণে হজরত সোলায়মানের আসরের সালাত কাজা হয়ে গিয়েছিল। তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সব ঘোড়া কুরবানি করে দিলেন। 'ঘোড়াগুলোর কারণে আমার ইবাদতের ব্যাঘাত ঘটেছে। সুতরাং এগুলোকে আর রাখা যায় না।'

কিছু কিছু তাফসিরকারক বলেছেন, 'এরপর তিনি আল্লাহর নিকট সূর্যকে ফিরিয়ে দেবার আবেদন করেন। সে মতে সূর্যকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি আসরের সালাত আদায় করে নেন। তারপর সূর্য অস্তমিত হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

নিষ্প্রাণ দেহটি

কুরআনে কারিমের মাধ্যমে আল্লাহপাক বলছেন—

> 'আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ রেখে দিলাম। অতঃপর সে রুজু হলো।'[৯]

এ বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা কেবল এতটুকুই। সেই নিষ্প্রাণ দেহটি কিসের ছিল। একে সিংহাসনের উপর রাখার কারণ-ই-বা কী ছিল। এর মাধ্যমে কী ধরনের পরীক্ষা করা হলো—এসব বিবরণ কুরআন বা হাদিসে কিছুই বলা হয়নি। অতএব এ বিষয়ে কেবল এতটুকু ইমান রাখা উচিত যে, সোলায়মান এভাবে পরীক্ষায় পতিত হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি আল্লাহর প্রতি আরও বেশি রুজু হয়েছিলেন।

ইনশাআল্লাহ

সহিহ বুখারির বর্ণনা মতে, একদিন হজরত সোলায়মান মনে মনে ভাবলেন, আজ রাতে আমি আমার সকল স্ত্রীর সঙ্গে বিছানায় যাব। সোলায়মান আলাইহিস সালামের প্রায় শতাধিক স্ত্রী ছিলেন বলে কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি ভাবলেন, আমি প্রত্যেকের সাথে মিলিত হব। যাতে প্রত্যেকের গর্ভ থেকে একটি করে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং বড় হয়ে তাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে। কিন্তু এ সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে গেলেন। ব্যাপারটি আল্লাহর পছন্দ হলো না। ফলে মাত্র একজন স্ত্রীর গর্ভ থেকে একটি অপূর্ণাঙ্গ ও মৃত শিশু ভূমিষ্ঠ হলো।

আল্লাহপাক বুঝিয়ে দিলেন, বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাদশাহ হলেও এবং জিন, বায়ু, পক্ষীকুল ও সকল জীবজন্তু তাঁর হুকুম-বরদার হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই করার ক্ষমতা সোলায়মানের ছিল না।[১০]

---

[৯] সুরা সোয়াদ : ৩৪।

অপকথা

আল্লাহর নবি হজরত সোলায়মানের সাথে রানি বিলকিসের বিয়ে হয়েছিল! সোলায়মান তাঁর রাজত্ব বহাল রেখে তাকে ইয়ামেন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন! প্রতি মাসে তিনি একবার করে সেখানে যেতেন এবং তিনদিন করে থাকতেন! সেখানে বিলকিসের জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন... ইত্যাদি সবগুলো কথাই ধারণাপ্রসূত। যার কোনো বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই।

আংটি সমাচার

'হজরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম একজন মহিলাকে বিয়ে করেন—যার প্রতি তিনি আসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন! ওই মহিলা তাঁর অগোচরে মূর্তিপূজা করতো। আর সোলায়মানের রাজত্ব ছিল তাঁর আংটির কারণে। একদিন তিনি ওয়াশরুমে যাবার সময় অভ্যাসবশত আংটি খুলে উক্ত স্ত্রী আমিনার নিকটে রেখে গিয়েছিলেন। এমন সময় একটি জিন সোলায়মানের রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে আংটিটি নিয়ে নেয়... সোলায়মান বেরিয়ে এসে দেখেন তাঁর সিংহাসনে অন্যজন বসে আছে এবং লোকেরা সবাই তাকে মেনে নিয়েছে...

কিছুদিন পর সেই জিন একটু দয়াবনত হয় এবং সোলায়মানকে তাঁর আংটি ফিরিয়ে দেয়। অথবা আংটিটি জিন শয়তানের কাছে ৪০ দিন থাকার পর মাছের পেট থেকে উদ্ধার করে পুনরায় সিংহাসন ফিরে পান তিনি...'—ইত্যাদি গল্পকে স্রেফ আষাঢ়ে গল্প এবং 'ইসরাইলি উপকথা' বলে প্রত্যাখ্যান করাই ইমানের দাবি। একজন নবির শানের সাথে এই কথাগুলো মোটেও যায় না। নবির মুজেজা আংটি নির্ভর না। এটা আল্লাহর বিশেষ দান। আল্লাহর দান-কুদরত খবিস জিন ছিনিয়ে নেবে, নবি বিপাকে পড়ে যাবেন, আঙটি ছাড়া... এগুলো নিছক বকওয়াস ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

---

[১০] কোনো কোনো তাফসিরকারক এই বর্ণনার সাথে সিংহাসনে মৃত প্রাণী রাখার একটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন এভাবে; ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে সোলায়মানের যে মৃত এবং পঙ্গু সন্তান জন্মেছিল, তাঁর একজন কর্মচারী সেই সন্তানটিকেই এনে সিংহাসনে রেখে দিয়েছিল। অবশ্য এই ঘটনার পক্ষে কোনো সঠিক দলিল নেই। সুতরাং এগুলো বিশ্বাস না করাই ভালো।

হারুত ও মারুত

'আল্লাহপাক হজরত সোলায়মানের সত্যতা প্রমাণের জন; অর্থাৎ, তিনি যে জাদুকর নন, তিনি যে আল্লাহর নবি—এটা বোঝাবার জন্য আসমান থেকে দুজন ফেরেশতা পাঠালেন। একজনের নাম হারুত, অন্যজনের নাম মারুত। তাঁরা দুনিয়ার এসে নারীর চক্করে পড়ে গেলেন। ডিউটি ভুলে দুজনেই সেই নারীর প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। একপর্যায়ে 'জুহরা'-নামী সেই নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেলেন তাঁরা। ফলে আল্লাহর পাকড়াও নেমে এলো তাদের উপর। আল্লাহপাক তাদেরকে বাবেল শহরের একটি কুপে নিম্নমুখী করে ঝুলিয়ে রাখলেন। এখনো তাঁরা ঝুলে আছেন। কিয়ামত পর্যন্ত ঝুলে থাকবেন। আর সেই কুপটি বাইরে থেকে তালা দেওয়া থাকায় এখন আর কাছে গিয়ে দেখার সুযোগ নেই।'

কাহিনিটি বেশ রসালো না? বানোয়াট গল্প শুনতে ভালোই লাগে। আর এই ভালো লাগা গল্পগুলি নুন-মরিচ মাখিয়ে বাজারে ছেড়ে রেখেছে কিছু লোক। অবাক করা ব্যাপার হলো, এই একুশ শতকে এসেও কিছু লোক এমন পাওয়া যায়, যারা তালা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখার গল্প আগ্রহের সাথেই বিশ্বাস করেন।

অথচ, আল্লাহপাক তাঁর ফেরেশতাদের এমন মেটেরিয়েলস দিয়ে তৈরি করেছেন, যাতে অবাধ্যতার নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হবেন—ফেরেশতাদের সৃষ্টিগতভাবে সেই ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। প্রকৃত ঘটনা হলো,

বেইমান জিনেরা 'যখন সোলায়মান একজন জাদুকর, তিনি জাদুর জোরে সবকিছু করছেন'—এমন কথা মার্কেটিং করতে লাগল এবং মানুষকে ধোকা দিতে আরম্ভ করল, তখন আল্লাহপাক নবির মুজেজা ও শয়তানদের জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দেবার জন্য হারুত ও মারুত নামে দুজন ফেরেশতাকে মানুষের বেশে ইরাকের বাবেল শহরে পাঠালেন। 'বাবেল' ছিল ইরাকের জাদুর নগরী। ফেরেশতাদ্বয় সেখানে এসে মানুষকে বোঝাতে লাগলেন, সোলায়মান আলাইহিস সালামকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেটা আল্লাহর তরফ থেকে মুজেজা; জাদু নয়।

ইনতেকাল এবং বায়তুল মাকদিস নির্মাণ

ঐতিহাসিক বিবরণ মতে, কাবা ঘর নির্মাণের ৪০ বছর পরে ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা আদম আলাইহিস সালামের কোনো সন্তানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বায়তুল মাকদিসের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছিল। অতঃপর হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তা পুণনির্মাণ করেছিলেন। তার প্রায় হাজার বছর পরে দাউদ আ. পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং সোলায়মান-এর হাতে সমাপ্ত হয়। নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনও বাকি রয়ে গেছে। এই অবস্থায় সোলায়মানের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে।

কাজগুলি অবাধ্য এবং বজ্জাত জিনদের উপরে ন্যস্ত ছিল। তারা হজরত সোলায়মানের ভয়ে কাজ করছিল। এরা যদি বুঝতে পারে, নবি আর বেঁচে নেই—তাহলে কাজ ফেলে পালাবে। কী করা যায়?

সোলায়মান আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে তাঁর কাঁচ নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন—যাতে বাইরে থেকে ভিতরে সবকিছু দেখা যায়। তিনি তাঁর লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন—যাতে রুহ্ বেরিয়ে যাবার পরেও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ দাঁড়িয়ে থাকে।

তা-ই হলো। ইনতেকালের পর আল্লাহর হুকুমে তাঁর দেহ উক্ত লাঠিতে ভর করে একবছর দাঁড়িয়ে থাকল। দেহ পঁচল না, খসল না বা পড়েও গেল না। জিনেরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কাজ শেষ করল। কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহর হুকুমে কিছু উইপোকার সাহায্যে লাঠি ভেঙ্গে দেওয়া হলো এবং সোলায়মানের লাশ মাটিতে পড়ে গেল। কুরআনের ভাষায়—

> 'অতঃপর যখন আমরা সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণপোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনরা বুঝতে পারল। যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানত, তাহলে তারা এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির আজাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকত না।'[১১]

হজরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম ৫৩ বছর বেঁচেছিলেন। এর মধ্যে ৪০ বছর ছিলেন রাজ-ক্ষমতায়। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র রাহবাআম ১৭ বছর

---

[১১] সুরা সাবা : ১৪।

রাজত্ব করেছিলেন। তারপর বনি ইসরাইলের রাজত্ব বিভক্ত হয়ে যায়। শেষ নবির আবির্ভাবের প্রায় ১৫৪৬ বছর পূর্বে নবিসম্রাট সোলায়মান আলাইহিস সালামের মৃত্যু হয়।

শিক্ষা

হজরত সোলায়মান আলাইহিস সালামের জীবন থেকে এবং একই সাথে মরণ থেকেও বেশ কিছু শিক্ষা খুঁজে পেতে পারি আমরা। এই যেমন :

১. নবুওয়াত এবং রাষ্ট্রক্ষমতা একত্রে একই ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া সম্ভব; যদি দুটো পরিচালনার যোগ্যতা থাকে।

২. রাজনীতির সাথে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। যদি হয় সুস্থ ধারার রাজনীতি।

৩. ক্ষমতা পেয়ে অহংকারী না হওয়া এবং আল্লাহর প্রতি বিনীত থাকা। কারণ, সকল ক্ষমতার উৎস হলেন তিনি।

৪. যতই আয়ত্বে থাকুক, ভবিষ্যত কাজের বেলায় 'ইনশাআল্লাহ' বলা।

৫. স্ত্রী-সন্তান, মাল-সম্পদের প্রতি ইহলৌকিক আগ্রহ থাকতেই পারে। কিন্তু সেটা যেন ইবাদতের ব্যাঘাত না ঘটায়। যেন আল্লাহবিমুখ না করে।

৬. ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলতেই হবে, সেটা বাবার সিদ্ধান্তের বিপরীত হলেও।

৭. আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অদৃশ্যের খবর জানেন না। সোলায়মানও জানতেন না। পিপীলিকা 'ওয়াহুম লা ইয়াশ-উরুন' বাক্যের মাধ্যমে সেটাই জানিয়ে দিলো।

৮. দেবার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। একটি ছোট্ট পোকাও এই আকিদা রাখে।

৯. মৃত্যু সকলের জন্যই অবধারিত। নবি-রাসুল যে-ই হোন, সময় শেষ হয়ে এলে আর একটি মুহূর্তও দেরি করা হয় না।

১০. আল্লাহ চাইলে লাশের মাধ্যমেও কাজ করাতে পারেন।

সুশীলগিরি

একশ্রেণির লোক আছেন আমাদের দেশে, যাদের কেতাবি নাম সুশীলশ্রেণি বা সুশীলসমাজ। নামটি তাদের জন্য আমরাই বরাদ্দ করেছি। প্রগতির দোকান খুলে বসে আছেন তাঁরা। দোকানে সাজিয়ে রেখেছেন প্রগতির পসরা। প্রতিটি পণ্যের গায়ে সাটানো রয়েছে একটি কমন ট্রেডমার্ক। যে যত বেশি ধর্মবিদ্বেষী হিশেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে, সে হবে তত বড় প্রগতিশীল। ইসলামের পক্ষে কোনো কথা বললে বা কাজ করলে সেটা হবে প্রগতির নীতির বিপরীত। সুতরাং সবসময় ইসলাম থেকে গুনে গুনে ১০০ হাত দূরে থাকতে হবে।

সময় সময় সেই চিহ্নিত মহলটি আদাজল খেয়ে নেমে পড়েন কলমবাজিতে। নসিহতের ঝড়ি বর্ষাতে থাকেন বিরামহীন। ইসলামের পক্ষে কেউ কোনো কথা বললে 'স্বাধীনতা গেল, মুক্তবুদ্ধি গেল, প্রগতি গেল' বলে এসব টাকুমাথা বুদ্ধিজীবীরা গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করতে থাকেন তোতাপাখি স্টাইলে। তোতা নিজের কোনো মতামত বা ভাব প্রকাশ করে না। যা শুনে, তাকে যা শেখানো হয়—তা-ই মুখস্থ বলে যেতে থাকে।

প্রগতির ঠিকাদাররাও ঠিক তেমনি করে একে অন্যের থেকে যা শুনেন, তা নিয়েই মেতে উঠেন। কেউ যদি তাদের কাউকে বলে; 'জনাব, কিছুক্ষণ আগে একটি চিল এসে আপনার বাম কানটি ছিড়ে নিয়ে গেছে,' তাহলে তাঁরা কানটি উদ্ধারের জন্য চিলের পেছনে দৌড়ে মোটামুটি 'বেনাপোল বর্ডার' পর্যন্ত যাওয়ার আগে কানে হাত দিয়ে দেখবেন না কান আছে কি নেই।

এক লোককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'দুই আর দুই কত?'

সে জবাব দিলো, 'চার রুটি।'

- আরে ভাই, 'চার' বললেই তো হতো। সাথে রুটির কী দরকার ছিল? পাশে দাঁড়ানো অন্য আরেক লোক তখন ব্যাখ্যা করে দিলো ব্যাপারটি, 'ওর পেটে ক্ষিধা তো, তাই সে চারের সাথে রুটি যোগ করেছে।

আমাদের বামধারার বুদ্ধিবিশারদরা সবকিছুতেই রুটি খুঁজে বেড়ান।

তাদেরকে বলুন, 'নামাজ পড়াতো ফরজ;' তাঁরা বলবেন 'ধর্মান্ধতা'! বলুন তাদের, 'রমজানের রোজা রাখতে হবে;' তাঁরা বলবেন, 'মধ্যযুগীয় রীতি'।

‘পর্দাপ্রথা তো মহান আল্লাহর বিধান;’ তাঁরা জবাব দেবেন, ‘নারী স্বাধীনতার অন্তরায়, শেকল’। বলে দেখুন, ‘চুরি করলে হাত কাটার বিধান রয়েছে ইসলামে;’ তাঁরা বলবেন, ‘বর্বরতা, মানবাধিকার বিরোধী’।

বাংলা অভিধান ঘাটাঘাটি করে তাঁরা কিছু শব্দ বের করে রেখেছেন। মৌলবাদ, ধর্মান্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল, মধ্যযুগীয় ইত্যাদি। ইসলামের যেকোনো প্রসঙ্গ সামনে আসলেই কোনো একটা ফিট করে ফেলেন। কেউ করেন ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে, কেউ তাদের বাইরের প্রভুদের নিমকহালালির কারণে, কেউ করেন ইসলামবিদ্বেষের কারণে আবার কেউ এজন্য যে, তা না-হলে সঙ্গীসাথিরা মাইন্ড করবেন। ভাববেন, মুক্তবুদ্ধি, মুক্তচিন্তার নীতি থেকে সরে এসেছেন। প্রগতিশীল হিশেবে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

দুঃখ হয় ওই লোকগুলোর জন্য! আল্লাহপাক দয়া করে বাড়তি কিছু মগজ দিয়েছিলেন তাদের। তাঁরা ওই মগজগুলো ভুল পথে ব্যবহার করছেন। এবং তারচেও বড় কথা হলো, ভুল পথে যে ব্যবহার করছেন—বুঝতেও চেষ্টা করছেন না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি এবং অগ্রগতির কৃতিত্ব দাবি করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন তাঁরা; অথচ, যে ব্রেইনটুকু ব্যবহার করে এই অগ্রগতি অর্জন করলেন—একটিবারও ভেবে দেখছেন না এই ব্রেইন তাদের দিলো কে!

সুশীল মানে কী

সুশীল বলতে কারা—এটার কোনো মানদণ্ড বা পরিমাপক কারও কাছেই নেই। যে কারণে অনেক সুশীলের বচন, বাচন ও আচরণ দেখলে তাদেরকে সুশীল না ভেবে সু-শীল ভাবতেই ভালোলাগে। সেটা ভিন্ন কথা। বাহ্যিকভাবে যারা মিডিয়ায় বলেন, কাগজে লিখেন, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে মাইক্রোফোন গরম করেন—তাদেরকেই সুশীল বলে ধরে নেওয়া হয়। লাগামহীন কথাবার্তা বলতে পারলে তিনি সুশীলে কামেল। আর দেশের ভাবমূর্তিকে বিশ্ববাজারে প্রশ্নের মুখোমুখি এনে দাঁড় করাতে পারলে তিনি আন্তর্জাতিক সুশীল। এই সুশীলদের পদভারে বিষাক্ত টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, দিনাজপুর থেকে আশুলিয়া—৫৬ হাজার বর্গমাইল। এই সুশীল বাবাজিরা যদি তাদের মুখের লাগামটা একটু শক্ত করতেন, তাহলে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের ইমেজ অন্যরকম হতে পারত।

মোল্লারা সেঁকেলে, মাদরাসাগুলো জঙ্গি প্রজনন করছে, বেকার সমস্যা...ভাঙ্গা রেকর্ড বাজছে তো বাজছেই। ফিতা আর শেষ হয় না। শেষ আর হবারও

নয়। ডিজিটাল ক্যামেরা এখন। রেকর্ড করতে ফিতা লাগে না। সারাদিন বসে বসে যত রকম নষ্ট চিন্তা করা সম্ভব, করে মধ্যরাতে কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে গিয়ে বমি করা। অথবা বছর জুড়ে জমিয়ে রাখা আলতু-ফালতু চিন্তাকে চেতনার মলাটে ভরে বইমেলায় চালান করে দেওয়া!

যার-যা-যখন, যেমন খুশি, বলছেই।

এদের কাছে কেউ কখনো কথার জমা-খরচ তো চায় না।

আচ্ছা আসলেই কি তারা বলে? নাকি তাদের দিয়ে বলানো হয়! মাইক থেকে ধ্বনিত হয় আওয়াজ। সেটা তো আসলে ধ্বনি নয়। সেটা হলো, প্রতিধ্বনি। মাইক কথা বলে না। কথা বলেন অন্য কেউ। পৃথিবী এগিয়েছে অনেক। রোবটমানবের যুগ এখন। রোবট কথা বলে মানুষের মতো করে। রোবট হাঁটাচলা করে ঠিক যেভাবে মানুষ হাঁটে। বলনে-চলনে তারা মানুষের মতো হলেও মূলত তারা মানুষ না। যন্ত্রের যান্ত্রিক যোগফল মাত্র। রিমোট হাতে অন্য কেউ। দৃশ্যকাব্যের পেছনে বসা। রোবটের পেছনে লেগে লাভ কী?

এরাই সুশীল!

এই যে সুশীল!

এরাই কিন্তু সকল অনিষ্টের মূলে আছে নষ্ট কারিগর হয়ে।

ভূতের পা পেছনে থাকে। পানির মরা উপরে দেখে না।

তবুও তারা ভালো হয়ে যাক।

হেদায়াত নসিব হোক।

মোনায়েমি স্টাইল

যারা লেখক হিশেবে মোটামুটি একটা অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন, তাঁরা যদি বাজারি লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যান; অর্থাৎ, লেখার জমা-খরচ থাকে না, তাহলে কীভাবে হবে! এই যে জাফর ইকবাল স্যার ভূতের বাচ্চার নাম ভূমিকায় একজন নবির নাম নিয়ে আসলেন, এই যে অন্যরা ঘোড়ার ডিম, হাতির আন্ডা, যা মন চায় লিখে ফেলছেন—কী ব্যাখ্যা আছে এসবের।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান বাংলা একাডেমির একটি প্রোগ্রামে এসেছিলেন। ১৯৬৬/৬৭-এর কথা বলছি। পাকিস্তানে তখন রবীন্দ্রসংগীত রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। খান সাহেব ছিলেন আবার মারাত্মক সাহিত্যানুরাগী।

বক্তৃতায় দাঁড়িয়ে কপালে ভাঁজ ফেলে ভুরু কুঁচকে ডানে-বামে মস্তক দুলিয়ে সমবেত কবি-সাহিত্যিকদের উদ্দেশে ব্যথা-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—

> 'আমি আপনাদের উপর বহুত নারাজ! আপনারা এত এত কবিতা এবং গান লিখে ফেললেন; কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ একজন একটা রবীন্দ্রসংগীত লিখতে পারলেন না!'

বাংলাদেশের কিছু মানুষের তথাস্তুগিরি কায়দায় লেখালেখি আর চেতনার গান গাওয়া শুনলে মোনায়েম খানকে একটু বেশিই মনে পড়ে।

মুক্তচিন্তা : বড় আজিব এক চিজ!

মুক্তচিন্তা : এটি একটি মারাত্মক অস্ত্র। যে অস্ত্র ব্যবহার করে একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে তোলা যায়। বাক্যটি ব্যবহার করে এমন এক আবহ তৈরি করে ফেলা সম্ভব যে, তালপট্টি থেকে শুরু করে মেথরপট্টি, ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের যেখানে যেমন খুশি, বলা যায়। যা খুশি করা যায়। লিখে ফেলো যা খুশি। কার সাধ্য আছে কিছু বলে। ঘুড়ি আকাশে ওড়ে নাটাইয়ের জোরে। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। তবুও বলে ফেলি। হারানো দিনের সেই সুরে—

ছায়াবাজি পুতুলরূপে বানাইয়া মানুষ
যেমনে নাচাও তেমনে নাচি পুতুলের কী দোষ!

যখন ব্লগার ছিলাম

প্রথম আলো ব্লগ বন্ধ ঘোষণা করবার আগ পর্যন্ত সাড়ে চার বছর সেখানে লিখেছি, কমেন্টস করেছি। আড্ডা দিয়েছি রাতভর। বেশ কজন ভালো লেখক-বন্ধু পেয়েছিলাম সেখানে। উপভোগ্য ছিল সময়টা। ব্লগসংক্রান্ত দুটি বইও আছে আমার। আমি মোটামুটি জানি, ব্লগ মানে কী আর ব্লগে যারা লিখত তাঁরা কেমন ছিল। অতএব, গুটিকতেক অসভ্য-ইতরশ্রেণির ব্লগারের কারণে ব্লগজগত নিয়ে মন্তব্য করে নিজের অজ্ঞতার জানান না দেওয়াই ভালো।

যেহেতু ব্লগে লেখতাম, এই অর্থে একজন ব্লগারই ছিলাম।

এ নিয়ে মজার একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি আগে।

কয়েকজন ব্লগার কর্তৃক ইসলাম অবমাননা ইস্যুতে হেফাজতে ইসলামের আন্দোলন তখন দেশজুড়ে। তার কদিন পরে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী গহরপুর জামিয়ার ছাত্র সংসদের বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারক হিশেবে জামিয়ার প্রিন্সিপাল মুসলেহুদ্দীন রাজু আমন্ত্রণ জানালেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে কথা বলবার জন্য উপস্থাপক মীম মুফিয়ান আমাকে আহ্বান জানানোর প্রাক্কালে নামের আগে হেন-তেন যুক্ত করার পাশাপাশি বলে বসলেন... 'এবং বিশিষ্ট ব্লগার জনাব রশীদ জামীল...'। লক্ষ করলাম, মঞ্চে উপবিষ্ট বড় বড় হুজুররা মাথা ঘুরিয়ে বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছেন আমার দিকে! তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি তাদের একটি ছেলে এভাবে 'ব্লগার' হয়ে যেতে পারে!

যথেষ্ট থেকে আরেকটু বেশি বিব্রতভঙ্গিতে ব্লগ যে একটি অনলাইন ডায়েরি এবং ব্লগার মানেই যে নাস্তিক না—সে বিষয়েই কয়েক মিনিট কথা বলে আস্তে করে এসে বসে পড়লাম নির্ধারিত আসনে।

কথাগুলো আজ শেয়ার করার কারণ, কিছুদিন আগে নিহত নাজিম উদ্দিন সামাদ। ব্লগে লেখালেখির সুবাধে সবগুলো ব্লগেরই কিছু না কিছু খবর থাকত আমাদের কাছে। ব্লগ মিটআপও হতো মাঝেমধ্যে। কখনো ব্লগের সেসব অনুষ্ঠানে ঢাকায় গিয়ে হাজির হতাম আবার কখনো দলবেঁধে অনেকেই সিলেট চলে আসতেন।

বখাটে মরলেই ব্লগার হয়

নাজিম উদ্দিন সামাদও কোনো ব্লগার ছিল না। ফেসবুকে টুকটাক স্ট্যাটাস লিখত শুনেছি। সেটাও শুনেছি তার মৃত্যুর পর। অথচ, অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হবার পর সেও এখন আপাদমস্তক ব্লগার!

নাজিম সামাদ হত্যা ইস্যুতে নড়েচড়ে বসেছে বিশ্ব। প্রায় একই সময়ে ঢাকায় একটি মসজিদের মুয়াজ্জিনও খুন হয়েছেন। সেটা নিয়ে উচ্চবাচ্য না থাকলেও নাজিম সামাদ এখন ফ্রন্টলাইন বিশ্বমিডিয়ায় অন্যতম প্রধান নিউজ। তাকে নিয়ে নিউজ করেছে সিএনএন-ও। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বরাতে সিএনএন ছোট্ট অথচ, অশনিসংকেতবাহী যে নিউজটি করেছিল এবং এমন আরও যে নিউজগুলো হচ্ছিল তখন, সবগুলোর মর্ম যদি তাদের সামনে ক্লিয়ার থাকত, যারা ফেসবুকে এসে স্বস্তিজনক স্ট্যাটাস দিয়ে ইমানি জজবা দেখাচ্ছেন, তাহলে তাদের ভাবনা অন্যরকম হতে পারত। সিএনএন-এর নিউজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল এমন—

`Bangladeshi authorities have previously denied that foreign terror groups such as al Qaeda or ISIS have taken root in the majority-Muslim country.'

অতি আবেগি উচ্ছ্বসিত স্ট্যাটাস আর ফেসবুকীয় ইমানি জজবা যে একধরণের দায় নেওয়ার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এটাও যদি বোঝার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলি, তাহলে তো ভবিষ্যৎ আমাদের মহা উজ্জ্বল!

অতি প্রগতিবাজি

আপনার আল্লাহকে, আপনার রাসুলকে, রাসুলপত্নী মায়মুনা-আয়েশাকে নিয়ে কুৎসিত কথাবার্তা বলবার পরও আপনার চামড়ায় যদি না লাগে, উল্টো সেই কুলাঙ্গারগুলোর পক্ষে আপনি যদি সুশীলগিরি ফলান আবার নিজেকে মুসলমানও বলেন; দুঃখিত, এমন ভণ্ডামির স্থান ইসলামে নেই। এমন ভণ্ডদের ইসলাম মুসলমান হিশেবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। আপনি অন্য রাস্তা দেখুন।

রাজিব হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ভার্সিটি ছাত্রদের পরিচয় আপনার কাছে শুধুই দুষ্কৃতকারী। এক্ষেত্রে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আপনার আলোচনার টার্গেটে আসে না; কিন্তু ওয়াশিক বাবু হত্যার অভিযোগে গ্রেফতারকৃতরা কোনো মাদরাসায় পড়ালেখা করলে গলার রগ ফুলিয়ে মাদরাসার নাম বলে বলে চিৎকার করেন! ডাবল স্ট্যান্ড ভণ্ডামিটা এবার ছাড়ুন না। অনেক তো করলেন। আর কত!

বিচারবহির্ভূত হত্যা, যাকে যে কারণে এবং যাদের দ্বারাই হোক—অবশ্যই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। একথা যেমন সরকারি বাহিনীর বেলায়, একইভাবে স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি বা মাদরাসা ছাত্র—সকলের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য। এখানে ক্লাসিফিকেশন করার অপর নাম ভণ্ডামি। ভণ্ডবাদ নিপাত যাক।

চেটে খাওয়া সেই চেতনা

বড় লম্বা লম্বা কথা বলেছিল সেদিন মেকি প্রগতিশীলতার উচ্ছিষ্ট প্রডাকশন! কাকদের শখ জেগেছিল ময়ূর হবে। হিংসার নর্দমায় গলা ডুবিয়ে শুরু হলো এক আন্দোলন। নাম দেওয়া হলো অহিংস আন্দো... একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইনকমপ্লিট থেকে গিয়েছিল। তারা করবে আসল যুদ্ধ,

দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ! সারাদিন চিল্লানো আর রাতে গিয়ে ফেন খাওয়া, হাড্ডি চোষা—এভাবেই বীর বিক্রমে এগিয়ে চলছিল তাদের মহান বিরিয়ানি যুদ্ধ।

কিন্তু মনিব ছিল সচেতন। একজন ভালো বক্তার সেরা গুণ যেমন কখন থামতে হবে জানা, তেমনি একজন ভালো মনিবের গুণ হলো কখন থামাতে হবে সেটা বোঝা। 'আমার দেওয়া হাড্ডি চুষে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমারই মুখের উপর কথা বলবে আর আমি সহ্য করবো—তা তো হয় না'। শুরু হলো কিমা থেরাপি। প্রথমে বন্ধ করে দেওয়া হলো হাড্ডি সাপ্লাই। তেজ কমে আসলো বীর যোদ্ধাদের। তারপর সামান্য গরম পানি... ব্যস, শৌর্য-বীর্যবানদের বীর্যপাত হতে আরম্ভ করল পেছনের রাস্তা দিয়ে! আর এভাবেই বড় অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করে করে লেজ গুটিয়ে জনগণের রাস্তা জনগণকে খালি করে দিতে হলো অদম্য কদম আলিদের। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কেউ কোনোদিন মুক্তিযোদ্ধাদের(!) এভাবে বিনাযুদ্ধে পালিয়ে যেতে দেখেনি; প্রথম দেখল।

রাজাকারের বিচার চাইছিলাম আমরাও। লিখিতভাবে। ৯৬ থেকে। বিচার চাইছিল তারাও। তফাত হলো, আমরা চাইছিলাম নিজের খেয়ে আর তারা নাচছিল বিরিয়ানির বিনিময়ে, হাড্ডি চিবিয়ে। বাটোয়ারা নিয়ে ঝামেলার শুরু হবার পর যখন এ বলে—'তুই খেয়েছিস ১৩টা হাড্ডি'; ও জবাব দেয়, 'তুই না খেলি ৩৯টা'। তখন সত্যিকার বিচার চাওয়ারা এদের ছায়া থেকেও দূরে সরে গেল। হাড্ডি খাওয়া কুকুর আর বিবেকওয়ালা মানুষের সহাবস্থান হয় না। নিয়ম নেই।

সাংবিধানিক কোপ

গেলবার রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে পেঁয়াজ্জল খেয়ে নেমেছিল ছইতে মরার দল। তাঁরা চেয়েছিল, আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কাজ আদায় করে নেবে। আশার গুড়েবালি পড়েছিল তাদের। কারণ,

জাতীয় সংবিধানের প্রথম ভাগ; প্রজাতন্ত্র অধ্যায়।

২ ক অনুচ্ছেদ :

> 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।'

একই অধ্যায়ের ৪ ক অনুচ্ছেদ :

> 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।'

'বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' এবং 'বঙ্গবন্ধু জাতির জনক'—একই অধ্যায়ের দুটি অনুচ্ছেদ। ঠিক যেভাবে সংবিধানের বাকি একশ' একান্ন অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদ। এর আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাও সংবিধানের অংশ ছিল। আদালতের রায়ের মাধ্যমে বাতিল করিয়ে নেওয়া হয়েছে! আদালতের ঘাড়ে রামদা রেখে এভাবেই যদি কোপাকুপি চলে, তাহলে পরিবর্তনশীল সময়ের অনিবার্যতায় আগামীতে গণেশ কখনো পাল্টে গেলে সংবিধান থেকে কার কার অস্তিত্ব যে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে কেউ জানে না! যত যা বলা থাক আর যেভাবেই লেখা থাক, আদালতকে দিয়ে যদি পুরো সংবিধানই স্থগিত কিংবা বাতিল করিয়ে নতুন করে লেখার ফরমান জারি করিয়ে নেওয়া হয়, তখন কী হবে? এই ভাবনা থেকেই সম্ভবত রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের উপর কোপটি আর মারা হয়নি। প্রগতিবাজরা লেজ গুটিয়ে ঘরে ফিরে গেছে।

সংবিধান নিয়ে বার বার এক্সপেরিমেন্ট হয়। হওয়া উচিত না। তাহলে সংবিধান হয়ে যাবে অন্য দশটা-পাঁচটা লেখকের বইয়ের মতো একটি বই। আর তাহলে কোনো একদিন জাফর ইকবাল স্যাররা হয়তো মোনায়েমীয় স্টাইলে বলেও বসতে পারেন, 'হায়! এই জীবনে এতগুলো বই লিখে ফেললাম; কিন্তু এখনো একখান সংবিধান লেখতে পারলাম না! আফসোস!

এটা-ওটা-সেটা

> 'বর্তমান সরকার কখনো ইসলামের প্রতিপক্ষ ছিল না। বঙ্গবন্ধু "ইসলামিক ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইজতেমার জন্য জমি বরাদ্ধ দিয়েছেন। আরও কত কাজ করে গেছেন তিনি! বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নিয়মিত নামাজ পড়েন। প্রতিদিন ভোরবেলা

তেলাওয়াত করেন। সেই নেত্রী ক্ষমতায় থাকতে ইসলামের কোনো অবমাননা হবে না। প্রশ্নই আসে না।'

... উপরের কথাগুলো বলবার পরিবেশ তৈরির জন্যই রাষ্ট্রধর্ম বাতিলের আওয়াজ ওঠানো হয়েছিল বলে ধারণা করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যদিও 'দোয়েল'কে 'জাতীয় পাখি' ঘোষণা করে রাখায় দোয়েলের বাড়তি ডানা গজিয়ে যায়নি; সেটা ভিন্নকথা।

কারণ অবশ্য আরেকটি থাকতে পারে। সেটা আবার মূল কারণও হতে পারে। এই সরকার প্রমাণ করেছে ডিকশনারিওলারা 'অ্যাটেনশন ডাইভার্ট' কথাটি তাদের জন্যই তৈরি করেছিল। সূত্রটি এত দক্ষভাবে এর আগে কেউ আর কাজে লাগাতে পারেনি। আগামীতেও পারবে কি না সন্দেহ আছে। সরকার যখনই কোনো গ্যাঁড়াকলে পড়েছে, একটা কিছু হুলুস্থুল করিয়েছে অথবা বলিয়েছে। তখন দেখা গেছে মানুষ ওটা ভুলে এটা নিয়ে মেতে ওঠেছে! এটা নিয়ে মাতামাতি যখন চরমে চলে গেছে, সামনে নিয়ে এসেছে সেটা। সেটা আবার নতুন কিছু। এভাবেই 'এটা-ওটা-সেটা' নিয়ে বঙ্গকন্যার সংসার।

উসকানিবাজি

পিলখানা, শেয়ারবাজার, হলমার্ক, সোনালি ব্যাংক... ধামাকে পর্যন্ত চাঁপা দেওয়া গেছে! আবুল হুসেন, সুরঞ্জিত, মাঈনুদ্দিন বাদলদের কেলেঙ্কারিকে দানা বাঁধতে দেওয়া হয়নি। সাগর-রুনি, বেডরুম পাহারা, গুমতন্ত্র, ইলিয়াস আলী, সাত খুন, নূর হোসেন—সব আছে আন্ডার কন্ট্রোল। আর সবকিছু হালাল করার জন্য আছে মাস্টারপ্লান। যে প্লানের অংশ হিশেবে কখনো কামরুল বকছেন, কখনো হানিফ, কখনও হাসান মাহমুদ। কখনো লতিফ সিদ্দিকি তো কখনো আগাচৌ, অথবা হিন্দু-বৌদ্দ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

এতে করে কী হয়?

যা হবার তাই হয়। টুপি-দাড়ি-পাঞ্জাবিওলারা মাঠে নামে। 'জান দিমু, রক্ত দিমু, মানি না, ফাঁসি চাই' বলে আসমান-জমিন এক করে ফেলে। সরকার তখন বসে বসে হাসে। হাসে আর হালকা করে কাশে। কাশির ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় গিয়ে কাটাতারের দেয়ালে। তারপর...

... তার আর পর নাই। ওপারের কারিশমায় শুরু হয় সরাসরি। বিশ্ব দেখে উগ্রপনা। বিশ্ব ভাবে উন্মাদনা। মেসেজ ছিল সেটাই দেবার। ভিত নিয়ে ভীতি

একটু কমে আসে। আতিউররা পদত্যাগ করেন। যে দেশের অর্থমন্ত্রীর কাছে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা মাত্র হয়, যে দেশের পত্রিকা সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা হয় ১০-১২ হাজার কোটি টাকার, সে দেশে আতিউর এন্ড কোম্পানির দায় তো ছিল ৮০০ কোটি। বেচারা বলির পাঠা আতিউর।

মউতের ফেরেশতা

বাংলাদেশের উচ্চ আদালত এবং জাতীয় সংসদ—দুটিই সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। অবশ্য কে কার উপর খবরদারি করবে, সেটা সংবিধানে স্পষ্ট নয়। এই সুযোগে আদালত এবং সংসদকে প্রায়ই আমরা মুখোমুখি হতে দেখি। বিচারক ধমকি দেন সাংসদকে। সাংসদ হুমকি দেন বিচারককে। নিস্তার পান না প্রধান বিচারপতিও। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বশেষ জায়গা আদালতের সদর দরজায় মোটা হরফে একটি প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে! দিনদিন চিহ্নটি বড় হচ্ছে! ঠিক হচ্ছে না। বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থার জায়গাটি ছোট হয়ে আসা রাষ্ট্রের জন্য ভালো কোনো ব্যাপার হবে না।

সংবিধানের কোনো ধারা নিয়ে জাতীয় সংসদে বিভ্রান্তি দেখা দিলে সর্বশেষ ব্যাখ্যা হবে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা। আবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারককে অভিশংসিত করার ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাহলে ঘুরে ফিরে ঘটনা কী দাঁড়াল? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'র পরিধি কি আদালত পর্যন্ত বিস্তৃত করে নেওয়া হলো না! এই অবস্থায় কর্তার ইচ্ছার মৃত্যু হলে মউতের ফেরেশতা স্বপদে বহাল থাকবেন? সুযোগ আছে? এই অংশটি এরচে বেশি ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। যারা বুঝলেন, তাঁরা তো বুঝলেনই। যারা বুঝলেন না, তাদের না বুঝালেও চলবে।

একটি রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হচ্ছে সংবিধান। এভাবে ইচ্ছামত প্লাস-মাইনাস খেলা চললে সংবিধান হবে খেলার পুতুল। রাষ্ট্রে চলবে পুতুল নাচ। পুতুলকে যে যখন যেভাবে নাচায়, পুতুল সেভাবেই নাচে। এখন যেমন নাচানো হচ্ছে। আগামীতে যেভাবে নাচানো হতে পারে। ৭ কোটি মানুষ কি একটি পুতুল রাষ্ট্রের জন্যই লড়াই করেছিল?

আই অ্যাম জিপিএ ফাইভ

জাফর ইবকাল স্যাররা প্রায়ই একটি কথা বলেন। তাঁরা বলেন, 'কওমি মাদরাসাগুলো বেকার উৎপাদন করছে। বৈষয়িক জ্ঞান পাচ্ছে না কওমি ছেলেরা।' ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মানে তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে তাঁদের ছাত্ররা। তাই যদি হয়, তাহলে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের ছেলেরা কেন 'আই এম জিপিএ ফাইভ' হয়!

স্বীকার করি এটা সামগ্রিক চিত্র নয়। এসএসসি পাশ করা সকল ছাত্রছাত্রীই যে নেপচুনকে নেপালের রাজধানী ভাবে—তাও আমরা ভাবি না। এ-মাইনাস পেয়ে পাশ করা ছাত্রদেরও জানা থাকার কথা জিপিএ'র পূর্ণ রূপ কী! কিন্তু বিচিত্র এই চিত্রও তো আছে—এটাও তো স্বীকার করতে হবে। তাহলে মোটিভ অব দ্য সাবজেক্টটা কী দাঁড়ায়?

কাগজের কারিশমায় তারা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। স্যার মুহম্মদ জাফর ইকবালদের স্বপ্নের সারথী তারা। যদিও তাদের আইকিউ আর একটি খরগোশের আইকিউ-এর মধ্যে তফাত নিয়ে গবেষণা হতে পারে। সেটা ভিন্ন কথা। অভিন্ন ব্যথার কারণ হওয়া উচিত এই ক্যাটাগরির অনুপাত।

বাংলাদেশে কেতাবি ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা দুটি :

একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা,

বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা।

সামগ্রিক চিত্র চিত্রায়িত করা হলে একমুখী দ্বিমুখী চতুর্মুখী বহুমুখী—মুখ গুনে শেষ করা যাবে না। যে কারণে একই বয়সের দুটি ছেলে দুই প্রতিষ্ঠান থেকে আসা, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সাবজেক্টিভ কথা বললে মনে হবে একজন আমাজন থেকে এসেছে অন্যজন খাগড়াছড়ির। অথচ, তাঁরা একই দেশের নাগরিক। বিশ্বের আর কোথাও এমন আনকমন চিত্র কমন পড়বে কি না আমি জানি না।

'পিথাগোরাস একজন ঔপন্যাসিক! জাতীয় সংগীত কাজী নজরুলের লেখা! বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ১৬ ডিসেম্বর! বিজয় দিবস ২৬ ডিসেম্বর! মাউন্ট এভারেস্ট ইংল্যান্ডে অবস্থিত...' এই কথাগুলো যদি কোনো কওমি মাদরাসার বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে বলানো যেত, তাহলে প্রগতিবাজ চেতনাধারীরা বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর পর্দা ফাটিয়ে ফেলতেন! কপাল খারাপ! কথাগুলো বেরিয়েছে এসএসসি এবং এইচএসসিতে জিপিএ ফাইভ

পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের জবান মোবারক থেকে! আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম এ ব্যাপারে গলাবাজ বুদ্ধি-ব্যবসায়ীদের আলোচনার ধরনটা কেমন হয় দেখতে। যে ব্যবস্থার অপব্যবস্থাপনায় এসব আমড়া কাঠের ঢেঁকি তৈরি হচ্ছে, সেটা নিয়ে তাদের বয়ানগুলো জানতে।

নিরাশ হলাম আমি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টায় কোনো ক্রটি করা হলো না। অবশ্য এ যাত্রায় মাছগুলো ছিল সাইজে বড়। যে কারণে শাকের ফাঁক দিয়ে বার বার মাথা বের করে ফেলে।

কিছুদিন আগে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কয়েকজন পদস্থ দায়িত্বশীল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন, 'পাশের হার বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাদের প্রতি মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ ছিল!' ভেতর বাড়ির গোপন খবর প্রকাশ করার পর তাদের কারও চাকরি গেছে কি না অথবা কারও চাকরি আছে কি না—সেটা আর জানা যায়নি!

মাচরাঙা টিভির প্রতিবেদনটি দেখার পর শিক্ষামন্ত্রী লজ্জা পেয়েছিলেন কি না জানি না। না-ও পেতে পারেন। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী একজন পুরুষ মানুষ। লজ্জা নারীর ভূষণ। তবে রিপোর্টটি দেখবার পর দেশের অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গর্ববোধ করতে শুরু করেছিল এই ভেবে যে, ভাগ্যিস! পড়ালেখার পেছনে সময়টা তাদের নষ্ট হয়নি! দেশের স্বাধীনতা দিবস কবে, বিজয় দিবস কত তারিখে হয়েছিল; এই কমন প্রশ্নগুলোর জবাব অন্তত তাঁরা জানে। পড়ালেখা না করেই জানে।

তারা সবাই GPA-5 ফাইভ পেয়ে ঢোল বাজাচ্ছিল। বেরসিক মিডিয়া দিলো প্যাঁচটা লাগায়া—

প্রশ্ন : তুমি তো GPA-5 পেয়েছ। GPA এটার পূর্ণাঙ্গ রূপ কী?
উত্তর : এখন মনে পড়ছে না!

প্রশ্ন : 'আমি GPA-5 পেয়েছি' এর ইংরেজি কী হবে?
উত্তর : I am GPA-5

প্রশ্ন : 'এসএসসি'। পূর্ণাঙ্গ রূপ কী?
উত্তর : জুনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট!

প্রশ্ন : শহিদ মিনার কোথায়?
উত্তর : সরি, জানি না!

প্রশ্ন : শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস কবে?
উত্তর : ১৭ আগস্ট!

প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কবে?
উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : অপারেশন সার্চলাইট কী?
উত্তর : অপারেশন করার সময় যে লাইটটা জ্বালায়!

প্রশ্ন : স্বাধীনতা দিবস কবে?
উত্তর : ১৬ ডিসেম্বর!

প্রশ্ন : বিজয় দিবস কবে?
উত্তর : ২৬ ডিসেম্বর

প্রশ্ন : জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায়?
উত্তর : পারি না।

প্রশ্ন : রণসঙ্গীতের রচয়িতা কে?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্ন : জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা কে?
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম

প্রশ্ন : মাউন্ট এভারেস্ট কোথায়?
উত্তর : ইংল্যান্ড

প্রশ্ন : তুমি সাইন্সে পড়েছ। পিথাগোরাস কে?
উত্তর : একজন ঔপন্যাসিক!

আল্লাহ জাতিকে রক্ষা করেছেন। যদি এদের কাউকে প্রশ্ন করা হতো, আচ্ছা বলতো, 'বাঙালি জাতির জনক কে?' তাহলে কে কার নাম বলতো আল্লাহ মালুম।

পুনশ্চ : তখন ভেবে পাইনি এইচএসসি পাস একটি ছেলে 'আই অ্যাম জিপিএ ফাইভ' বলবে কেন? ক্লাস সেভেনের একজন ছাত্রেরও তো এই বেইসিক ইংলিশটা জানার কথা। ঘটনা কী?

অবশ্য, জুন ২০১৮-তে এসে একই টেলিভিশন চ্যানেলের আরেকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থেকে ব্যাপারটি মোটামুটি ক্লিয়ার হলো। জিপিএ ফাইভ পয়সা দিয়ে কেনা যায়।

শিক্ষা কাকে বলে

শিক্ষা মানে সাদা কাগজে কালো হরফের অক্ষর নয়। শিক্ষা মানে শুধুই থিওরি আর প্র্যাকটিস নয়। অন্যকিছুও। সেটি যদি থাকে তবেই সেটা শিক্ষা। আর না থাকলে যতবড় সার্টিফিকেট দ্বারাই মোড়ানো হোক, সেটা মূর্খতা থেকেও ডেঞ্জারাস! এই সত্যটি যদি শিক্ষিত মূর্খগণ না বুঝেন, তাহলে এমন প্রোডাক্ট বেরোতেই থাকবে! কিচ্ছু করার নেই।

যারা কওমি মাদরাসা নিয়ে মাইন্ডসেট থেকে কথা বলে টেলিভিশনের পর্দা কাঁপান, পত্রিকার পাতায় জ্ঞানবমি করেন, আশাকরি 'আই এম জিপিএ ফাইভ'র পর থেকে একবার 'কওমি মাদরাসার ছেলেগুলো কিচ্ছু জানে না' বলার আগে ১০ বার ভাববেন তাঁদের ছেলেরা কতটুকু জানে। আর এ বিষয়ে কথা বলার বা লেখার আগে *মাছরাঙার* ক্লিপটি একবার দেখে নেবেন।

তবুও তাঁরা আধুনিক; মাদরাসাওলারা গোঁড়া

অনেকগুলো কারণে মাদরাসাশিক্ষা এখনো আধুনিক হতে পারল না। কখনো পারবে বলেও মনে হয় না।

মাদরাসাশিক্ষা সেকেলে; কারণ, মেয়ের বয়েসী ছাত্রীদের কোমর ধরে ড্যান্সকরা শিক্ষক তৈরি করতে পারে না!

মাদরাসাশিক্ষা গোঁড়ামিতে ভরপুর; কারণ, চেতনাদণ্ডের অগ্রভাগ প্রদর্শনের মতো ছাত্র তৈরি করতে পারে না!

মাদসারা শিক্ষা অনগ্রসর প্রজন্ম তৈরি করছে; কারণ, তাঁরা তাঁদের শিক্ষককে বাথরুমে লক করে পেটানোয় অগ্রসর হতে জানে না!

মাদরাসাশিক্ষা অবশ্যই বন্ধ করে দেওয়া উচিত; কারণ, মাদরাসাগুলো চেতনাহীন এক প্রজাতি সৃষ্টি করছে।

শিক্ষকরা খেয়ে না খেয়ে দিনের পর দিন পড়ে থাকছেন ছাত্রদের পেছনে। ছাত্ররা তাদেরকে ধাওয়াও দেয় না, মাইরও দেয় না। তাদেরও ইচ্ছে করে না গলায় দড়ি দিতে। আর এতে করে নতুন শিক্ষকদের জন্য কর্মসংস্থান সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করে। বাড়ছে বেকার সমস্যা!

হায়রে চেতনারে!

আঙুলবাজি

প্রমাণ করতে হবে দেশে জঙ্গিবাদের উপদ্রব আছে। আর বিনা বাজেটে এই কাজটি করার জন্য টুপি-দাড়ি-পাঞ্জাবিওয়ালা প্রজাতিরচে উত্তম কাঁচামাল আর হয় না। একটু উসকানি দিয়েই এদের রাস্তায় নামানো যায়। তখন মুরব্বিদের বলা যায়, 'দেখ! দেশে কীভাবে মৌলবাদের উত্থান ঘটছে! এদের দমন করবার ক্ষমতা শুধু আমরাই রাখি। একমাত্র আমরাই পারি এদের পিঠিয়ে লাশ বানাতে। আর আমরা কী করতে পারি আর কতটুকু পারি শাপলায় তো সেটার প্রমাণ দিয়েছিই। আমাদের উপর আস্থা রেখো?' মসনদ আঁকড়ে থাকার জন্য এই টেকনিকটা খুবই জরুরি।

টেকনিক অবশ্য আরও কিছু করতে হয়। রাস্তা থেকে রক্তের দাগ শুকিয়ে গেলে রাস্তা আবার ভেজাতে হয়। কিছুদিন পর পর লাশ লাগে। সবচে লোভনীয় লাশ হলো অ্যান্টি ইসলামিস্ট লাশ। ব্লগার হলে সবচে ভালো। এক ঢিলে দুই শিকার। ইসলামিস্টদের দৌড়ের উপর রাখা যায়। বিশ্ববন্ধুদের বলা যায়—'এদের কথাই আমরা বলি। এরাই গণতান্ত্রিক বিশ্বের দুশমন। তবে চিন্তার কোনো কারণ নাই। আমরা এদেরকে সমূলে বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর।'

কিছুদিন পরপর আলিমুদ্দি-সলিমুদ্দি কাউকে দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে উল্টা-পাল্টা বকিয়ে চেষ্টা করা হয় মুসলমানদের সেন্টিমেন্টাল করতে। এবং তার পরপরই একটা দুইটা লাশ পড়ে! লাশ মর্গে যাওয়ার আগেই সরকারি জ্যোতিষীগণ এলান করতে শুরু করেন, 'এটা ধর্মীয় মৌলবাদীদের কাজ'! শুরু হয় ধর-পাকড়। মাদরাসায় মাদরাসায় হানা দেওয়া চলে; কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের ধরা হয় না। তারা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

মানুষ প্রথম প্রথম মনে করতো খুনিরা মনে হয় অতিরিক্ত রকমের ধূর্ত আর অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু ভিডিও ফুটেজ থাকার পরও যখন খুনিদের ধরা

হয় না; আবার সন্দেহভাজন খুনির সন্ধানে অভিযান চলে জাগায় জাগায়। বাতাসে ভাসতে থাকে মামু-খালু-দুলাভাইদেরে নাম। মানুষ তখন বুঝতে পারে কোথাকার পানি কার নির্দেশে কোন দিকে গড়াচ্ছে!

একটি সরকারের মূল সাফল্য হচ্ছে যখন যা দরকার করতে পারা। বর্তমান সরকার সেটা ভালোভাবেই করে দেখাচ্ছে। যখন দরকার ছিল, শাহবাগে হাড্ডি সাপ্লাই করা হয়েছে। দরকার যখন শেষ হয়েছে, ছুড়ে ফেলা হয়েছে গারবিজে। যখন দরকার পড়েছে, লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে আবদুল লতিফ সিদ্দিকিকে। দেশবাসী থেকে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ায় খুশি হওয়া গেছে। মুরব্বিদের বলতে পারা গেছে; 'বলেছিলাম না, দেশে উগ্রপন্থীরা অনেক বেশি ডেঞ্জারাস! দেখলে তো! এখন চিন্তা করো আমরা না থাকলে কী হবে!'

বর্তমান সরকার যে উপরে আল্লাহ আর নিচে ভারতের উপর ভরসা করেই টিকে আছে—এটা বোঝবার জন্য রাজনীতি বিশেষজ্ঞ হবার দরকার হয় না। সঙ্গত কারণেই এই সরকারের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো ভারতকে সন্তুষ্ট রাখা। এজন্য গুরুত্ব দিয়ে দুটি কাজ করা লাগবে।

১. নিয়মিত তৈল মর্দন অব্যাহত রাখা।

২. হিন্দুবান্ধব কথাবার্তা বলা এবং কাজ করা।

তেল দেওয়াতে সমস্যা ছিল না। সমস্যা হয়ে যায় সবকিছুতে সংখ্যালঘুত্বের আনুকুল্যিক অণুচিন্তায়। এক্ষেত্রে যে সমস্যাটি প্রকটভাবে সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলল সেটি হচ্ছে, নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ থিওরি। যেমন—

মন্দিরে আগুন দেওয়া হয়েছে। ওপার থেকে চাপ এলো, 'অ্যাকশনে যাও'। সরকারও নিয়ত করে মাঠে নামল। কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। কিন্তু সরকারি তদন্তের আগেই পাবলিক তদন্তে বেরিয়ে এলো হরিচরণ, কেদারনাথ বা কোনো গৌরাঙ্গের নাম। এই অবস্থায় সরকার না পারে দাদাবাবুদের ধরতে, না পারে মুসলমানকে ছাড়তে!

মুসলমানকে আঙুল দেওয়ার জন্য ডুগডুগি মতিয়া, বোরকা শওকত, মুরগি কবির, আলিমুদ্দি-সলিমুদ্দিরা সবসময় সোচ্চার। হাজি ইনু, আলহাজ্ব মেননরা আছেন বিশেষজ্ঞ ধারাভাষ্যকার হিশেবে। এরা আলেম-ওলামা ও মাদরাসা ছাত্রদের উসকানি দিয়ে রাস্তায় নিয়ে আসার দায়িত্ব দায়িত্বশীলতার সাথেই পালন করে থাকেন। ছোটখাটো বকওয়াসের জন্য কামরুল-হানিফ আর হাসান মাহমুদরা তো আছেনই।

কয়েক বছর আগে সুরঞ্জিত বাবু বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মকর্ম করার জন্য দেশ ছেড়ে সৌদি আরব চলে যেতে বলেছিলেন। মুসলমানরা বিচলিত হয়নি। কারণ ছিল না। মানুষ জানে, আশ্বিন মাস আসলে কিছু প্রাণীর পাগলামি বেড়ে যায়। তেমন পাগলদের পাগলামি নিয়ে কথা বলার কিছু নাই। তবুও অনেকেই বলেন। আমিও অনেক কথা বলে ফেললাম। কারণ, সামনের দৈনন্দিনতা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ যা-ই করা হোক—করতে যেয়ে কারও যাওয়া-আসা-থাকার সিঁড়ি না হওয়া অথবা কারও উপর ক্ষেপে গিয়ে তার নামে মিছিল বের করে তাকে বিশ্ব-পপুলারিটি পাইয়ে না দেওয়া।

চেইন অব ডিমান্ড

মগের মুল্লুক বলে আদৌ কোনো মুল্লুক বা দেশ যদি পৃথিবীর মানচিত্রে থাকত আর সে দেশের মানুষ সাম্প্রতিক বাংলাদেশের হাল-হকিকত সম্বন্ধে খবর পেত, আমি নিশ্চিত লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করতো তাদের। অথচ, মগরাজ্যে যে যাকে খুশি মেরে ফেলতে পারার সুযোগ থাকলেও লাশের হিসাব দেওয়া লাগে। তারা যখন দেখত বাংলাদেশে লাশের হিসাবও দিতে হয় না, আফসোস করতো তারা।

গাধা আর ঘোড়ার মিলনে খচ্চর পয়দা হয় বলে শুনেছি। মগজ-প্রতিবন্ধী উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল বাম খচ্চরদের সাথে মিলনের পর থেকে বাংলাদেশের সরকার একের পর এক যে কাণ্ডকলাপ ঘটিয়ে চলেছে, তাতে দেশের কপালে শনির দশা-বিশা-চল্লিশা একসাথে এসে ভর করছে। কী আছে কপালে, কেউ জানে না। অবশ্য জান বাঁচলে তবেই না কপাল!

'চেইন অব কমান্ড' শব্দটির সাথে মোটামুটি সকলেরই পরিচয় আছে। প্রতিটি রাষ্ট্রে চেইন অব কমান্ড থাকতে হয়। শুধু বাংলাদেশে থাকতে হয় না। বাংলাদেশ চলছে 'চেইন অব ডিমান্ড' ফর্মুলায়। চেইন অব ডিমান্ড-এর বাংলা 'চাহিদার পালাক্রম' বললে কেমন হয়? 'চাহিদার ধারাবাহিকতা' বলা যেত। তবে 'পালাক্রম' বাক্যটি আমার কাছে যুৎসই মনে হচ্ছে। আক্ষরিক অর্থেই তো ধর্ষিতা হচ্ছে দেশ। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক—সকলভাবে। ধর্ষণই তো এখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দর্শন। আর ধর্ষণের সাথে পালাক্রম শব্দটি যায় ভালো!

ওপার থেকে ডিমান্ড আসে, এপারে তামিল হয়। ওই পারে তারা আর এই পারে এরা; মাঝখানে নদীর মাঝে লাশগুলো ভাসে। ৩২ কোটি চোখ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। চেতনার বলীর পাঠা হয় নিরীহ মানুষ। শাপলায় লাশের স্তূপের

উপর চলে পৈশাচিক নৃত্য। 'ইসলামি সন্ত্রাসী' বলে রাজপথে কোপানো হয় বিশ্বজিতের মতো অমুসলিম ছেলেকেও! পাঠ্যালয়ে খুন হন শিক্ষক! মসজিদের ভেতরে ঢুকে হত্যা করা হয় মুয়াজ্জিনকে। রাষ্ট্রীয় টাকাচুরি চাঁপা দিতে তনুদের লাশ পড়ে! কাজের মেয়ে খুন হয় শরাবের মহিমায়। সোনালি ব্যাংক, হলমার্কের ফাঁদে পড়ে নিঃস্ব হয় লাখো লোক, অর্থমন্ত্রী মত্ত থাকেন রাবিশ আর বোগাস নিয়ে!

একটার পার একটা মানুষ খুন হচ্ছে দেশে, জমা-খরচহীন তরিকায়। একটার পর একটা আইন পাশ হচ্ছে দেশে, তথাস্তু কায়দায়। সংবিধানকে সাইজ করার পর একটার পর একটা ইসলামি অপরিহার্যতা ছেটে ফেলা হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক আঙিনা থেকে। নাস্তিক্যবাদের চাষাবাদে শিক্ষাঙ্গনের বীজতলা লিজ দেওয়া হচ্ছে তাদের হাতে, যাদের চেতনা আল্লাহমুক্ত! কিছুদিন পরপর একটার পর একটা খাটাসকে দিয়ে বকওয়াস করানো হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের মৌলিক প্রশ্নে। এগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভাবার কোনো কারণ নাই। পরিকল্পিত প্লানিংয়ের আওতায় একটা একটা করে ফরমান আসছে। সেভাবেই তামিল হচ্ছে।

ছোট বাচ্চাদের মুসলমানি দেওয়ার সময় হাতে কিছু একটা খেলনা ধরিয়ে দেওয়া হয়। মুখে তুলে দেওয়া হয় ললিপপ। বাচ্চারা চুষতে থাকে আর এই ফাঁকে আসল ঘটনা ঘটিয়ে ফেলা হয়। আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা বড় হলাম, একুশের দ্বিতীয় দশকে এসে পৌঁছালাম, সময় পাল্টালো, আবহাওয়া বদলাল; কিন্তু 'মুসলমানি'(খতনা) ভাগ্য আমাদের আর পিছু ছাড়ল না। ব্যবধান শুধু, ছোটবেলায় বাবা-ভাই পেছন থেকে under arms পজিশনে ঝাপটে ধরে 'আযাম' নামক সার্জনকে সুবিধা করে দিতেন। আর এখন ইউনিফর্ম পরা লোকজন over arms পজিশনে ঝাপটে ধরে সরকারকে সুবিধা দেয়। আর্মস মানে বাহুদ্বয়। আর্মস মানে অস্ত্র। যখন যেখানে যেমন। ছোটবেলায় কর্তিত হতো বিশেষ অঙ্গের বাড়তি অংশ। আর এখন কাটা হচ্ছে বিশ্বাসের শেকড়। বাংলাদেশের মুসলমানদের হাতে কখনো ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ধর্মাবেগের খেলনা, কখনো কথার ললিপপ। আমরা খেলছি। আমরা চুষছি। আর ওদিকে ধূতির প্যাঁচ আঁটোসাটো করে খেলারামও খেলে যাচ্ছে। চলছে খেলা সারাবেলা। নীরব নিয়ন্ত্রণে।

মেয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করে, 'ও বাবা! কোন কালারের ঘুড়ি বেশি উপরে উঠে?' বাবা বলেন, 'মারে! ঘুড়ি কালারের জোরে ওড়ে নারে মা, ঘুড়ি ওড়ে নাটাইয়ের জোরে।' ওপারে নাটাই হাতে কর্তা, এপারে কর্ম। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ঝগড়াঝাটি করে সংবিধানে যা-ই রাখা হোক—এটাই এখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম।

'বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী জাতিকে একটি শিক্ষানীতি উপহার দিয়েছেন। কী দিয়েছেন তিনি, বাংলাদেশের মুসলমানরা সেটা বুঝবে ১০/১৫ বছর পরে, যখন এ শিক্ষানীতির প্রডাকশন বের হতে থাকবে, তখন।' কথাগুলো বলেছিলাম ২০১৩-তে। বলেছিলাম, 'অলসতা আর খামখেয়ালির কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ স্বেচ্ছায় নিজেদের অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়া। নিঃস্পৃহ অভিলাস বিষাদের কারণ হয়। দেয়ালের বাঁকে বাঁকে থেকে যায় ছিদ্র। সুযোগ পায় ছিদ্রান্বেষীরা, ছলাকলা করে ঐতিহ্যের কফিনে পেরেক ঠুকার।'

পাঠ্যপুস্তক অধর্মায়িত বা ধর্মান্তরিত করা নিয়ে কথা হচ্ছে। এটা তো গর্তের একটা ইঁদুর মাত্র। গর্ত ভর্তি ইঁদুরে। একটার পর একটা বেরোতে থাকবে আর আমরা চিল্লাতে থাকব! কতদিন?

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ইন-কামিং আওয়ামীলীগার। আপাদমস্তক কমিউনিজমে বিশ্বাসী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আসার পর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র খোলা বাজারে বিক্রি হতে দেখেছি আমরা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকারের রেজামন্দি এবং না-রাজেগিজনিত কারণে শিক্ষকদের ক্লাস ছেড়ে পুকুরঘাটের বৃষ্টিতে ভেজার নাটকও হয়েছে। নাহিদ সাহেবের সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসের পর মাস চলতে থাকা কৃত্রিম অচলাবস্থা নিরসনে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। উনার সর্বশেষ খেলা পাঠ্যপুস্তককে গঙ্গাস্নান করানো। এতে এক সাথে দুটি নেককাম করা হবে :

এক. দাদার আদেশ পালন।
দুই. আদর্শিক নিমকহালালি।

'মহান আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস'-এর স্থলে বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি এখন ধর্মনিরপেক্ষতা। বাপকা বেটি যা বলেন, করেই

ছাড়েন। আল্লাহকেও ছাড় দেননি! বাংলাদেশের মুসলমান, বিশেষত আলেম-ওলামার জন্য এ হচ্ছে আরেক মহামসিবত। সংবিধানের কোনো ধারার বিরুদ্ধে কথা বললে সেটা হবে রাষ্ট্রদ্রোহিতা। আবার এমন অনেক ধারা আছে যেগুলো বিশ্বাস করলে ইমানই থাকবে না। আমি জানি না এ থেকে উত্তরণের উপায় কী!

তবে, বাংলাদেশ যতই ধর্মনিরপেক্ষতার বেশ ধরুক, আমেরিকা থেকে বড় ধর্মনিরপেক্ষ তো আর হয়ে যায়নি। সেই দাবিও করাও হয় না। তবে কাছাকাছি দাবি করতে ইদানীং শোনা যায়। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গ্রুপকে এমনভাবে লালন-পালন করা হচ্ছে, কোনো কিছুতে আল্লাহ বিশ্বাসের গন্ধ পর্যন্ত থাকলে সেটাকে ধর্মনিরপেক্ষতার খেলাপ ফাতওয়া দিয়ে শুরু হচ্ছে কথানৃত্য। নৃত্য চলে এপারে, গান বাজে ওপারে। অথচ, ধর্মনিরপেক্ষতার দেশ আমেরিকার ওয়ান ডলারের নোট থেকে নিয়ে ১০০ ডলারের নোট—সবগুলোতেই পরিষ্কার করে লেখা রয়েছে- IN GOD WE TRUST আমরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি। এটা লেখায় তাদের ধর্মনিরপেক্ষতাগিরিতে কোনো সমস্যা হয়নি।

আমেরিকার কন্সটিটিউশনাল রাইটস'র মধ্যে অন্যতম একটি রাইট হচ্ছে, যে কারও যেকোনো ধর্ম পালন করার বা না করার অধিকার। কিন্তু কোনো ধর্মের উপর আঘাত করলে সেটাকে 'হেইট ক্রাইম' হিশেবে আমলে নেওয়া হয়। যে কারণে আমেরিকার মতো একটি দেশে ২.৭ মিলিয়ন মুসলমান বুক উঁচিয়ে ইসলামের কথা বলতে পারছে। এদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা আছে, পুলিশ বা অন্যান্য বাহিনীতে যারা আছে, তাদের নাইনটি নাইন পারসেন্টই অমুসলমান; কিন্তু ইসলামি অনুষ্ঠানাদিতে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে তাঁরা। এমনকি যে দেশে খোলা রাস্তায় কোনো প্রোগ্রাম করার সুযোগ সেই, সেখানে নিউ ইয়র্কের মতো সিটিতে পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ করে বিশাল বিশাল ঈদের জামাত হচ্ছে। পুলিশবিভাগ থেকেই সেগুলোর পারমিশন দেওয়া হচ্ছে।

আমার উদ্দেশ্য আমেরিকার গুণকীর্তন করা নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ধান্ধা খাড়া করে বাংলাদেশে একটার পর একটা ইসলামবিরোধী আইন পাশ করবার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। আমি সর্ববৃহৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাষ্ট্র আমেরিকার উদাহরণ সামনে এনে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আসলে যে এটা একটা ভাওতাবাজি ছাড়া আর কিছুই না।

এখানে পাগল কারা? সরকার না জনগণ; পাঠক বসে বসে ভাবতে থাকুন। আর যাদের ভাবাভাবির প্রতি আগ্রহ নেই, তাঁরা একটা গল্প শুনুন।

একদেশের এক গণক গণনা করে রাজাকে জানাল, 'অচিরেই দেশে একটা বন্যা আসবে। সারাদেশ সেই বন্যার পানিতে সয়লাব হয়ে যাবে। এবং ভয়াবহ ব্যাপার হলো, সেই বন্যার পানি হবে পাগলা পানি। যেই লোক সেই পানি পান করবে, সে পাগল হয়ে যাবে।'

কী সাংঘাতিক কথা! সবাই পাগল হয়ে গেলে দেশ চলবে কীভাবে?

ভাবতে লাগলেন রাজা। পরামর্শ করলেন মন্ত্রীপরিষদের সাথে। গণককে বললেন, 'তাহলে উপায়'?

গণক বলল, 'জাহাপনা! প্রজারা পাগল হলে সমস্যা নাই; কিন্তু রাজা এবং মন্ত্রীরা পাগল হয়ে গেলে তো সমস্যা। রাষ্ট্র চলবে কীভাবে!'

- বুঝতে পারছি। উপায় বলো।

- আমি আপনাকে বিশেষ একটি ওষুধ দিচ্ছি। এটিকে পানির সাথে মিশিয়ে আপনি এবং আপনার মন্ত্রীরা পান করবেন। তাহলে আপনারা আর পাগল হবেন না।

রাজা বললেন, 'তবে তাই হোক'।

কিছুদিন পর বন্যার পাগলা পানি খেয়ে দেশের সবাই পাগল হয়ে গেল। ভালো থাকলেন শুধু রাজা আর তাঁর মন্ত্রীরা। তখন রাজা আর মন্ত্রীরা বলে দেশের মানুষ পাগল। আর দেশের সকল মানুষ বলে রাজা আর মন্ত্রীরা পাগল।

পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান : গণক ছিল পাশের দেশের। সে ছিল আগন্তক। সে ছিল একজন জাসুস। তার দায়িত্ব ছিল, যে করেই হোক রাজা এবং মন্ত্রীদের পাগল বানিয়ে দেওয়া। তাই সে ওষুধের নামে যে বস্তুটি সরবররাহ করেছিল, সেটি ছিল চুতরা এবং ধুতরা পাতার নির্যাস!

পয়েন্ট নাম্বার টু : কিছুদিন পর দেশে বন্যা এসেছিল ঠিকই; কিন্তু সেই পানি মোটেও পাগলা পানি ছিল না। প্রকৃতিক পানিতে আর যাই থাকুক; পাগল করার মতো কোনো পদার্থ থাকে না।

বাঁচতে হলে জাগতে হবে

ঘটনাটি ঘটবার পরপর লিখেছিলাম গুলশানের জিম্মি ঘটনাকে নিয়ে বাংলাদেশিদের বাংলায় ভাবতে হবে। অন্যমাথায় ভিন্নভাষায় ভাবলে কপালে দুঃখ আছে। আবেগি বা হুজুগে ভাবনা দেশের অস্তিত্বের সংকটকেই ঘনিভূত করবে। ভাবাভাবির কাজটা যদিও সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের; কিন্তু দেশের ১৬ কোটি মানুষকে হাত-পা গুটিয়ে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে থাকলে হবে না। নাগরিক নিরাপত্তা, সামাজিক শান্তি এবং জাতীয় সংকট থেকে দেশের মাটি ও মানুষকে রক্ষা করতে হলে জনগণকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিএনপি ক্ষমতায় ছিল; এখন তারা নেই। আজ আওয়ামীলীগ আছে, কাল হয়তো থাকবে না। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষকে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। সুতরাং ভাবতে হবে। আগাতে হবে ভাবনার মতো করে।

ভাবনা আগাতে পারে তিনটি সূত্র ধরে।

১. এই অপারেশনে হোতা কারা এবং তাদের উদ্দেশ্য কী?
২. ঘটনার প্রকৃত চিত্র কেমন? বাস্তবতা কী?
৩. এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয় কী?

তারা কারা

আসলেই তারা কারা, আমরা জানি না। কেউ এখনো জানে না। আমাদের আইন- শৃঙ্খলা বাহিনী 'এখনো নিশ্চিত করে জানায়নি কিছু। যদিও ঘটনাটি ঘটবার সাথে সাথেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীদের পক্ষ থেকে দায় স্বীকারের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এ বলে 'এটা আমরা করেছি', সে বলে 'এটা আমরা ঘটিয়েছি', সেগুলোকে আপাতত বেহুদা বকওয়াসের ঝুড়িতেই রাখা যাক।

নাচুনে বুড়িরা শিরোনাম তৈরি করে অপেক্ষাতেই ছিল। ঢোলের বাড়িটা পেয়েই নড়েচড়ে উঠল তারা। শুরু হলো প্রচারণা, 'বাংলাদেশে আইএস গোষ্ঠী হামলা চালিয়েছে! এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। আমরা আগে থেকেই সন্দিহান ছিলাম বাংলাদেশে এমন কিছু ঘটবে'! উহাকে বিশ্ব মিডিয়া বলে!

এক্ষেত্রে হোয়াইট হাইসের প্রতিক্রিয়া বরং যথেষ্ট বিবেচনাপ্রসূত ভাবা যায়। ওবামা বলেছেন, 'ঘটনার পেছনে কারা—অনুসন্ধান করে বের করতে হবে'।

বাজারি প্রচারণা অনুযায়ী গুলশানের ঘটনা আইএস ঘটিয়েছে। আপাতত এটা আমরা অবিশ্বাস করি না আবার বিশ্বাসও করতে চাই না। যে কারণে বাংলাদেশে 'জয় বাংলা' বলে হামলা করলে সেটা 'আওয়ামীলীগই করেছে' প্রমাণ হয় না। যে কারণে 'জয় মা কালী' বলে কোথাও হামলা চালালে সেটা 'হিন্দুরাই করেছে' প্রমাণ হয়ে যায় না। একই সূত্রে 'আল্লাহু আকবার' বলে হামলা করলেই এটা 'ইসলামি কোনো গোষ্ঠী করেছে' প্রমাণিত হয় না। এই সহজ সমীকরণ যদি কেউ না বুঝে, বুঝতে হবে সে আর তার মাঝে নাই। 'বিক্রিত মাল ফেরতযোগ্য নয়' ক্যাটাগরিতে চলে গেছে।

আমরা চাই আসলেই তারা কারা—খুঁজে বের করা হোক। আর যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যমতে একজনকে হলেও জীবিত ধরা গেছে, সুতরাং কোনো ধরণের অন্যায় প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে বের করা সম্ভব তারা কোন খোয়াড়ের মাল! এটা এখন খুব সহজেই সম্ভব। যদি না সংশ্লিষ্টরা অসম্ভব করে তুলেন!

তবে তারা যারাই হোক, উদ্দেশ্য তাদের একটাই। বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তোলা। যদি দেখতাম বেছে বেছে শুধু অমুসলিমদেরকেই হত্যার টার্গেট বানানো হচ্ছে, তাহলে বলা যেত এটা মুসলিম নামধারী সন্ত্রাসীদের কাজ। কিন্তু ঘটনা তো তা না। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরণের যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেখানে তো মুসলিম-অমুসলিম বাছ-বিচার করে হত্যা করা হচ্ছে না। এ থেকে কি এই কনক্লুশনে পৌঁছা যায় না—এসব ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে, তাদের কোনো দেশ নেই। তাদের কোনো ধর্ম নেই। তাদের পরিচয় একটাই। তারা সন্ত্রাসী। তারা মানবতার দুশমন।

কী ঘটেছে

ঘটনার ভয়াবহতার ভেতরগত খবর আমরা ততটাই জানি যতটা আমাদের জানতে দেওয়া হচ্ছে। সে মতে ছয় সন্ত্রাসী মারা গেছে। দুজন পুলিশ অফিসার এবং ২২ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন। দেশিদের বেলায় একটা সরকারি প্রেসনোট দিয়ে 'গভীর সমবেদনা' আকারে কিছু কথা বর্ষণ করে এবং নিহতদের পরিজনকে সামান্য কিছু টাকা-পয়সা ধরিয়ে দিয়ে দায়মুক্তির চেষ্টা

করা হতে পারে। সেটা কিছু সময়ের জন্য না হয় মেনেও নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিদেশি নাগরিকদের বেলায় এ ধরণের পদক্ষেপ তো যথেষ্ট হবে না। নিশ্চিত করেই স্ব স্ব দেশের কাছে বাংলাদেশকে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে হবে। সেটা কী হবে অথবা কেমন হওয়া চাই, ভাবা দরকার।

কার কী করণীয়

আমাদের সামনে সবচে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, এখন আমাদের করণীয়টা কী? বাংলাদেশ কি তবে নষ্টদের দখলে চলে যাবে? আমরা বসে বসে শুধু দেখব? নাকি কিছু করার আছে? থাকলে সেটা কেমন?

বিশ্ব-বাস্তবতার সামান্য খায়খবর আছে যাদের, তাঁরা জানেন এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এখন সারা বিশ্বেই ঘটছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটল। অবশ্যই জাতি হিশেবে আমাদের আতঙ্কিত হবার কারণ আছে। অবশ্যই এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে হালকা করে দেখবার কোনো সুযোগ নেই। আবার এই একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জঙ্গি রাষ্ট্র হয়ে গেছে—এমনটিও ভাববার কোনো কারণ নাই।

বিশ্ববাসী ভুলে গেছে, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে বাংলাদেশ শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলাভাইদের ঠাঁই দেয়নি। তাদেরকেও ক্ষমা করেনি। বাংলাদেশের মাটি কখনো কোনো উগ্র সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দেয় না। বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন কোনো সন্ত্রাসীর পক্ষে দাঁড়ায়নি। এখানেই বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ব্যবধান। এটাই সত্য। এই সত্যকে গর্বের সাথে প্রচার করার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা আমাদের গৌরবের অধ্যায়গুলোকে গুরুত্বহীন করে রেখে দেই। অপরিনামদর্শী স্টাইলে গলা মেলাই তাদের সাথে, যারা কখনো আমাদের ছিল না।

সার্বিক বিবেচনায় সময়ের অনিবার্যতা মাথায় নিয়ে আমরা যদি এখনি আমাদের কার কী করণীয়; সেটা ঠিক করে নিতে না পারি, সে অনুযায়ী যদি কাজ না করি, তাহলে আল্লাহ না করুন, গুলশানের ঘটনা হবে টেস্ট কেইস। সামনের দিনে আরও বড় ভয়াবহতার মুখোমুখি হওয়া লাগতে পারে। যারা বাংলাদেশের আলো-বাতাস খেয়ে বেড়ে ওঠেছেন, দেশের পাশে দাঁড়ানো তাদের সকলের জন্য ফরজ। চলুন ঠিক করি আমরা কে কীভাবে কী করতে পারি। কার কোন্ দায়িত্ব।

সরকার

বর্তমান সরকার কীভাবে সরকারে আছে, সেই প্রশ্ন যথাস্থানেই থাকুক। কথা হোক মৌলিক প্রশ্নে। আমার জানামতে পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যে দেশের সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের দেশনীতি বিদেশনীতি আমূল বদলে যায়! এই অসুস্থ প্রবণতা বন্ধ হতে হবে।

রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সরকারকে সতর্কতার সাথে কথা বলতে হবে। তিলকে তাল বানিয়ে তালগাছ আকারে প্রচার করা যে আত্মঘাতী ব্যাপার, সেটা বুঝতে হবে। আমরা বলি না সরকার 'চুরি'কে 'না বলে নিয়ে যাওয়া' বলুক। কিন্তু ঝড়ের পর আম কুড়ানো নিয়ে বাচ্চাদের ঝগড়াঝাটিকে যদি সরকারি তরফ থেকে দাঙ্গা বলে প্রচার করা হয়, তাহলে বাইরের লোক সেটাকে কী বলবে!

ভারতে তাজ হোটেলে হামলা হলো। মারা গেল অনেক। তারা কি সেটাকে ভারত রাষ্ট্রের ব্যর্থতা বা অথর্বতা হিশেবে প্রচার করেছিল! কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্টেইটে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছিল। তাতে করে কি যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য হয়ে গেছে বলে প্রচার পেয়েছিল!

কেন নয়?
কারণ, এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা।
কারণ, এগুলো অপ্রত্যাশিত ঘটনা।
কারণ, সন্ত্রাসীদের কোনো নীতি নাই। দেশ নাই। ধর্ম নাই।
এটা কি আমরা বুঝি? আমাদের সরকার বুঝে? নাকি বোঝার চেষ্টা করে?

রাজনীতিকগণ

বাংলাদেশের এই প্রজাতির মুখের লাগামটা আরও শক্ত হওয়া দরকার। বিশেষত সরকারি দলের ছায়ায় থাকেন যারা। কোথাও কোনো ঘটনা ঘটলেই যারা সেখানে ইসলামি মৌলবাদ এবং আমদানিকৃত জঙ্গিবাদের গন্ধ পান এবং মিডিয়ার সামনে এসে বমি করা শুরু করে দেন। এই বমি করা বন্ধ করতে হবে। অপরিনামদর্শী বেফাঁস কথাবার্তা দেশের জন্য সমস্যার কারণ হয়। মনে রাখতে হবে তাঁরা হলেন নেতা। আর মাছের পচন যেমন শুরু হয় মাথা থেকে, জাতির পচনটাও শুরু হয় নেতা থেকে। পচন ঠেকাতে হবে।

সুশীলশ্রেণি

যদিও সুশীল বলতে কারা, সেটার কোনো মানদণ্ড বা পরিমাপক কারও কাছেই নেই। যে কারণে অনেক সুশীলের বচন, বাচন ও আচরণ দেখলে তাদেরকে সুশীল না ভেবে সু-শীল ভাবতেই মন চায়। সেটা ভিন্ন কথা। বাহ্যিকভাবে যারা মিডিয়ায় বলেন, কাগজে লিখেন, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে মাইক্রোফোন গরম করেন, তাদেরকেই সুশীল বলে ধরে নেওয়া হয়। এই শ্রেণিকে কথাবার্তায় আরও হিসেবি হতে হবে। তাদের লাগামহীন কথাবার্তা দেশের ভাবমূর্তিকে বার বার প্রশ্নের মুখোমুখি এনে দাঁড় করাচ্ছে। তাঁরা তো ইনিয়ে-বিনিয়ে এবং কপালের চামড়া টানিয়ে বলেই খালাস। কিন্তু দেশে বিদেশে সেটার কী প্রভাব পড়ে, সেটা তাদের ভাবনায় থাকে না।

মিডিয়া

এক্ষেত্রে সবচে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটা দেশজ মিডিয়ার পালন করবার কথা। অথচ, দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আমাদের মিডিয়াগুলো মিডিয়াই হলো, বাংলাদেশি মিডিয়া আর হতে পারল না। তারা এত বুঝে; কিন্তু এটা বুঝে না যে, অন্য যে কেউ যেকোনো ঘটনা ঘটালে যেখানে সেটা হালকা-পাতলা সন্ত্রাসবাদ, সেখানে মুসলিম নামধারী কেউ সেই একই ঘটনা ঘটালে যারা সেটাকে জঙ্গিবাদ নাম দিতে চায়; তারা এটা কেন চায়!

আমাদের মিডিয়া সব বুঝে। শুধু এই কথাটি বুঝে না যে, বাংলাদেশ বিদ্বেষীগোষ্ঠী চাইছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে লুটে খেতে। তারা চাইছে আমাদের মানচিত্রে থাবা বসাতে। সেটার জন্য একটা জানালা দরকার, যা দিয়ে হুড় হুড় করে এসে ঢোকা যায়। যা খুশি করা যায়। ইচ্ছামত নাচা যায়। আমাদের মিডিয়াগুলো সেই জানালার গ্রিল খুলে দিচ্ছে। জঙ্গি জঙ্গি বলে এমন সাউন্ড করছে, যেটা সাউন্ড গ্রেনেড থেকেও মারাত্মক আকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বে! আমাদের অতি সমঝদার মিডিয়া কবে বুঝবে এটা করে তাদের রাস্তাকেই উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে, যারা ফনা তুলে আছে বাংলাদেশের শরীরে ছোবল মারার জন্য!

আলেম-ওলামা

আপনারা আর কী করবেন! দেশ গোল্লায় যাক। আপনারা বসে বসে খতমে খাজেগান পড়ুন। কেউ যদি আল্লাহ রাসুলকে নিয়ে উল্টা-পাল্টা কিছু বলে, তবেই আপনারা মাঠে নামবেন। বাকি সময়টা দরস-তাদরিসে আর বিবিদের সুহবতেই থাকুন।

লজ্জা করা উচিত আপনাদের। আপনারা যাদের উত্তরসূরি বলে দাবি করেন, সেই ওলামায়ে দেওবন্দ দেশের জন্য শুধু রক্ত নয়, গণহারে জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছেন। দেশের মাটি ও মানুষের জন্য উৎসর্গিত ছিল তাদের জীবন। আপনারা অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে সেই ইতিহাস ভুলে বসে আছেন। আপনাদের আর কী বলার থাকে!

ইসলামের উপর আঘাত এলে আপনারা প্রতিবাদমুখর হন। অবশ্যই হবেন। কেউ আল্লাহ নিয়ে বকওয়াস করলে, নবীকে অপমান করে কিছু বললে আপনারা ক্ষুব্ধ হন। অবশ্যই হওয়া দরকার। কিন্তু দেশের স্বার্থে সেই মানের প্রতিবাদ নিয়ে কোনো দিন রাস্তায় নেমেছেন? দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি আপনাদের কোনো দায় নেই?

প্লিজ জাগুন। প্লিজ মুখ খুলতে শিখুন। দেশের স্বাধীনতা ও মানচিত্রে এতদিন শকুনের চোখ ছিল। এখন থাবা পড়েছে। আপনাদের জাগা উচিত। তবুও যদি না জাগেন, তাহলে সেটা এমন এক পাপ হবে, যে পাপের ফল ভোগ করতে হবে আগামীর বাংলাদেশকে।

বাংলাদেশের মানুষ

বাংলাদেশের মানুষ, ১৬ কোটি জনগোষ্ঠী। ৩২ কোটি হাত। ভিন্নমত আছে। ভিন্নপথ আছে। থাকুক সেগুলো। কিন্তু দেশের অস্তিত্বের প্রশ্নে তো কোনো দ্বিমত নাই কারও। সেখানটায় কেন হাতে হাত রাখা যাবে না।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে যারা আমার দেশের চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিতে চায়, তাদের দিকে একদলা করে থু থু নিক্ষেপ করলেই তো তাদের তলিয়ে যাবার কথা। তাদের মুখে এক ফোটা করে পেশাব করলে পেশাবের বন্যায় তাদের ভেসে যাবার কথা। এটাই তো জনতার শক্তি। এত শক্তি থাকার পরও কেন সেই জনতাকে ভক্তির ভর্ৎসনায় থাকতে হয়?

সরকারে কে আছে, কে আসবে—সেটা নিয়ে সময় নষ্ট করার সময় আর নাই। কর্ম না দেখে কারণ খোঁজা দরকার। ঘুড়ি ওড়ে নাটাইয়ের জোরে। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এখন নাটাইওয়ালাদের অবাধ বিচরণ! বাইরের প্রতিবন্ধকতা প্রায় শেষ। রাজনৈতিক ভিন্নমত ছিন্ন করে ফেলা গেছে। মোল্লা-মৌলবিদের সামনে জঙ্গিবাদের অপবাদ দাঁড় করিয়ে কোনঠাসা করে রাখা গেছে—বাঁধা এখন একটাই। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। এই বাহিনীকে শেষ করে দেওয়া গেলে বার্মার মতো প্রতিদিন বুড়িগঙ্গায় লাশের পর লাশ ভেসে ওঠা একটি নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করা হতে পারে।

এখন উপায়

উপায় একটাই। আমাদের সেনাদের বাঁচিয়ে রাখা। তাদের বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং তাদের পাশে থাকা। আওয়াজ উঠানো, আমার দেশের যেকোনো সমস্যা আমার দেশ সমাধান করবে। পাশের বাড়ির অতি আগ্রহী ভালোবাসা আমাদের লাগবে না। আমার দেশের জন্য আমার সেনাবাহিনীই যথেষ্ট। আমরা যদি এটা করতে পারি, তাহলে যে পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাংলাদেশকে, আশা করা যায় সেখান থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় এখনো ফিরিয়ে আনা যাবে।

শেষকথা

গুলশানে ১২ ঘণ্টা আগে সেনাবাহিনীকে ডাকলে হতাহতের সংখ্যা আরও কমে আসত কি-না—এই বিতর্ক পরেও করা যাবে। আপাতত সাময়িক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাক। শুকরিয়া আল্লাহর। ধন্যবাদ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন কমান্ডো বাহিনীকে। যারা নিহত হয়েছেন, তাদের আত্মা শান্তি পাক। যারা আহত হয়ে বেঁচে গেছেন, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।

আটককৃত একমাত্র জীবিতকে যেকোনো মূল্যে বাঁচিয়ে রাখা হোক। জিম্মি উদ্ধার পর্ব শেষ হয়েছে। এবার পরিচয় উদ্ধার পর্বটাও শেষ হোক। মানুষ জানতে চায় ওরা কারা? কারা তাদের নেপথ্যে?

আমরা আশা করছি, 'সন্ত্রাসীরা সবাই অন দ্যা স্পট নিহত হয়েছে। যে একজন বেঁচে ছিল, তাকে নিয়ে অভিযানে নামার পর আগে থেকে ওত পেতে থাকা বন্দুকধারীদের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্রসফায়ারিংয়ে সে-ও মারাগেছে'—এমন বক্তব্য শুনতে হবে না।

সময়ের ওপাশে কারা

কোনো ইউনিভার্সিটি উগ্রতার শিক্ষা দেয় না; এটা যেমন আমরা জানি, কোনো মাদরাসাও কাউকে উগ্র বানায় না; এটা তাঁরাও জানে। কিন্তু একশ্রেণির অপরিণামদর্শী অথবা অতি-উৎসাহী অথবা আত্মবিকৃত কিছু লোক দেশের কোথাও সন্ত্রাসী কোনো ঘটনা ঘটলে সেটাকে মাদরাসা-কেন্দ্রিক জঙ্গিবাদের তকমা দিয়ে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে যে কঠিন বাস্তবতায় মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখান থেকে দেশকে স্বাভাবিক স্থিতিতে ফিরিয়ে আনা আপাত-দূরহ একটি ব্যাপার। একই ভুল আজ অন্যরাও করছেন! গঞ্জনা ও লাঞ্ছনার শিকার মাদরাসাপড়ুয়া কেউ কেউ বলবার চেষ্টা করছেন, 'এতদিন তো আমাদের দোষলেন। এখন কী বলবেন? হামলাকারীরা তো ইউনিভার্সিটিপড়ুয়া ছেলে। এবার বলুন দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোতে জঙ্গির চাষ হয়! বলুন এগুলোও বন্ধ করে দেওয়া দরকার!'

আফসোস! 'তারা অধম হইলেও আমরা উত্তম হইব না কেন'—এই নীতিটি আমরা আত্মস্থ করতে শিখলাম না। আচ্ছা, আমরা কি মাদরাসা ছাত্র/ভার্সিটি ছাত্র হয়েই থাকব! আমরা কি আওয়ামীলীগ-বিএনপি হয়েই ভাবব! বাংলাদেশি হতে পারব না! আমরা কি এখনো শুনতে পাচ্ছি না ঝড়ের সাইরেন! আমরা কি এখনো দেখতে পাচ্ছি না ধ্বংসের দাবানল! আমরা কি তবুও বুঝতে পারছি না সাপ-লুডু খেলার বোর্ডে পরিণত হতে চলেছি আমরা! মই বেয়ে যতই উপরে উঠছি, ঠিকই নিয়ে ফেলা হচ্ছে সাপের মুখে।

দুই

গুলশানের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর থমকে গেছে সারা দেশ! একটু বেশিই আগ্রহী হয়ে ওঠেছে বিশ্ব। বিবিসি, সিএনএন যেভাবে নিউজের পর নিউজ, অতঃপর ফলোআপ করছে, যারা দেখছেন কেবল তাঁরাই বুঝতে পারছেন

কীভাবে কী বলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবুও যদি আমরা ঘিলুলেস কথাবার্তা বন্ধ করতে না পারি, তাহলে আর কবে করব!

বাংলাদেশের ঘোলাটে পরিস্থিতি এতদিন ছিল রাজনৈতিক। এখন সেটা জাতিগত সমস্যা। যে আকার ধারণ করেছে, তাতে এটা এখন আর সরকার বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই। এটা এখন ১৬ কোটি মানুষের সমস্যা। সুতরাং বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মনে রাখতে হবে, এর পরেও যদি বিভাজন বিভাজন খেলা চলে, এরপরেও যদি স্বজন-অভাজন কথা চলে, তাহলে দুঃখ আছে কপালে।

এক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার বক্তব্যটিকে যথেষ্ট ম্যাচিউরড এবং সময়সম্মত মনে হয়েছে আমাদের কাছে। তিনি বলেছেন, 'কে ক্ষমতায় থাকবে কে ক্ষমতায় যাবে—সেটা আজ বড় কথা নয়। আজ আমরা যারা আছি, আগামীতে কেউ হয়তো থাকব না। দেশ থাকবে, জাতি থাকবে। সেই দেশ ও জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আজ বিপন্ন। কোনো অর্জনই টিকবে না যদি আমরা সন্ত্রাস দমন করতে না পারি, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারি।' এটাই এখন হওয়া উচিত বাংলাদেশের সকল মানুষের একমাত্র স্লোগান।

তিন

অনেকেই একটি আশঙ্কার কথা বলছেন। বলছেন, এখন কলেজ-ভার্সিটিপড়ুয়া ছেলের বাবা-মা যদি দেখেন ছেলে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, যদি দেখেন কুরআন তেলাওয়াত করছে অথবা খুটিয়ে খুটিয়ে কুরআনের তরজমা পড়ছে, তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে যাবেন! ছেলে কি তবে কোনো... অজানা ভীতিতে ঘুম হারাম হয়ে যাবে তাদের।

এখন তবে কী হবে? ছেলেরা নামাজ-রোজা করতে পারবে না? করলে তাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকানো হবে? কী ভয়াবহ ব্যাপার! এই অবস্থার ইতিবাচক উত্তরণ ঘটাতে না পারলে ইমান-ইসলাম, দেশ-নিরাপত্তা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব কিছুই কি আর নিরাপদ থাকবে?

আমাদের এখন করণীয় কী?

সবকিছু কি তবে শেষ হয়ে গেছে?

আমরা মোটেও তা মনে করি না। আমরা হতাশ; তবে নিরাশ হয়ে যাওয়ার কারণ নেই। এখনো ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব। এখনো সম্ভব হাতে হাত রেখে মাটির মোহনায় মিলে যাওয়া। একাত্তরের চেতনার কথা তো মুখে অনেক বলা হলো। এখনই সময় চেতনার জাগরণের। দেশের নারী-পুরুষ সবাই মিলে বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি মাটিকে পাহারা দেওয়া; এটাই এখন চেতনার একমাত্র দাবি। আমরা কি মাটির দাবি মেটাতে এগিয়ে আসব?

চার

ব্রেইনওয়াশের কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, বাচ্চা ছেলেগুলোর ব্রেইনওয়াশ করে তাদেরকে কুপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কথাটিকে আমি অন্যভাবে বলতে চাই। পেন্টের জিপার থেকে 'এখনো পেশাবের গন্ধ না যাওয়া কিশোর ছেলেগুলোকে যারা এই পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে, সেটা ব্রেইনওয়াশ নয়। 'ব্রেইন' ওয়াশ করা হলে এক রতি ঘিলুও যদি অবশিষ্ট থাকত, তারা ওপথে পা বাড়াত না। তারা বুঝত এটা ইসলামের নামে জীবন দেওয়ার জান্নাতি পথ নয়। মানুষ মেরে জান্নাতে যাওয়া যায় না। এটা জাহান্নামের টিকেট কনফার্ম করার পথ।

এজন্য আমি ব্রেইনওয়াশ শব্দটির স্থলে ব্রেইন ডেমেজ শব্দটি ব্যবহার করতে চাই। যেকোনোভাবেই হোক, ছেলেগুলোর ব্রেইনের সার্কিট থেকে মানবিক সুস্থতার তারগুলো সব বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে। ফলে তাদের ব্রেইনের সিস্টেম পুরাই ডেমেজ হয়ে পড়ছে। তারা হয়ে যাচ্ছে একধরণের উন্মাদ। ভালোমন্দ বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা আর থাকছে না তাদের। তা না হলে ইসলামের কথা বলে তাদেরকে যদি বিভ্রান্ত করা হতে থাকে, তাহলে তারা একবার হলেও চিন্তা করতো, বাংলাদেশের লাখ লাখ আলেম-ওলামার কোনো একজনও কি কোথাও বলেছেন, এসব কর্মকাণ্ড ইসলামের অংশ! কেউ বলেছেন এসব সওয়াবের কাজ! বরং উল্টোটাই কি বলছেন না! এসব কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের দূরবর্তী কোনো সম্পর্কও নেই; এটাই কি বলা হচ্ছে না!

পাঁচ

'যদি তাদেরকে ইসলামের কথা বলে বিভ্রান্ত করা হয়ে থাকে'! 'যদি' শব্দটি ব্যবহার করলাম। এই যদি'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই 'যদি'র সাথে অনেকগুলো

'তবে-কিন্তু-এবং-সুতরাং'ও আছে। অনেকগুলো দৃশ্যমান কারণে 'যদি'টি অদৃশ্য। এই লাইনটি যারা বুঝতে পারলেন, তারা তো পারলেনই। যারা পারলেন না, তাদের আর বোঝার দরকার নাই।

ইসলাম কখনো মানুষ মারার পারমিশান দেয় না। ইসলাম পরিষ্কার জানিয়ে রেখেছে, 'কেউ যদি একজন মানুষ হত্যা করে, সে যেন গোটা মানবতাকেই হত্যা করল।' যারা নামাজ-রোজা ছেড়ে দিয়ে মানুষ মারায় মত্ত হলো, তারা তো ইসলামি সংজ্ঞায় মুসলমানের ক্যাটাগরিতেই পড়ে না। তাহলে আমি কী করে বিশ্বাস করব এরা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়েছে! তারা যদি ইসলামের নামেই প্রতারিত হয়ে এ পথে পা বাড়িয়ে থাকত, তাহলে তাদের নিজেদের জীবনে তো প্রথমে ইসলাম থাকত। কিন্তু বাস্তবতা তো তা বলে না।

তাহলে আসলেই এরা কারা?

কারা মূল ক্রীড়নক?

মুসলিম এরা হতেই পারে না। তবে তারা কারা?

কাদের সৃষ্টি?

কারা বেনিফিশিয়ারি?

এই প্রশ্নের জবাব শুধু মুসলিমবিশ্বকে নয়; তামাম বিশ্বকেই খুঁজে বের করতে হবে। যদি একটি নিরাপদ বিশ্ব চাওয়া হয়।

ছয়

বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের নামের আগে আজ বিরাট একটা প্রশ্ন চিহ্ন দাঁড়ানো। চেষ্টা চলছে চিহ্নটির স্থলে বিশেষ বিশেষণটি লাগিয়ে দেওয়ার। আমরা যদি এখনো সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করি, আমরা যদি এখনো মাটীয়তার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ না হই, তাহলে ধ্বংস হওয়া ছাড়া তো উপায় থাকবে না। জাতীয়তা না বলে মাটীয়তাই বললাম। জাতীয়তা নিয়ে বিভক্তিকর ভাবনা থাকতে পারে; মাটীয়তা নিয়ে কোনো বিভক্তি নেই।

এতবড় একটি দুর্ঘটনার পরেও উপর থেকে নিচ, আবাল প্রজাতির কিছু মানুষ তাদের গান্ধা মগজের দুর্গন্ধযুক্ত সেই চিরাচরিত ফাইজলামি স্টাইলের কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ করবার যথেষ্ট সুযোগ আছে এগুলো আসলেই বাংলাদেশি মাল কি না! নাকি নাড়ি অন্য কোথাও! ভিন্ন দেশের জারজ আগাছা!

সন্ত্রাসীরা কারা?

- এরা আইএস
- এরা জেএমবি
- হরকতুল জিহাদ
- প্রশিক্ষিত শিবির
- জামাত-বিএনপির লোক
- আওয়ামীলীগের ঘরের লোক

... এগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় দায়িত্বশীল পর্যায় থেকে সাপ্লাই দেওয়া কথা। বিশ্ব চাইছে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর জঙ্গি রাষ্ট্র হিশেবে ঘোষণা করতে। দেশের ভেতর থেকেই যদি, এই শ্রেণির মাথামোটা লোকদের জবান থেকেই যদি এই ভাষার কথা বেরোয়, তাহলে প্রথমে অনুসন্ধান করে বের করা দরকার এরা কোন দেশের দালালি করছে? নাড়ি তাদের কোথায়? তাদেরকে তাদের ঠিকানায় পুশইন করা দরকার। বাংলাদেশের আলো-বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে দেশের কলিজায় এভাবে ছিদ্র করার কোনো অধিকারই তাদের নেই। চলে যাক তারা তাদের নাড়ির দেশে। তাড়িয়ে দেওয়া হোক ঝাড়ুপেটা করে।

সাত

কয়েকটি ছেলে আত্মঘাতী হামলা করেছিল গুলশানে। এরা বাংলাদেশের হাই সোসাইটির বাবা-মায়ের সন্তান। যে কারণে এখন আর সেই ভাঙা রেকর্ড বাজানোর সুযোগ রইল না 'মধ্যবিত্ত গরিব ঘরের মাদরাসাপড়ুয়া ছেলেদের আর্থিক প্রলোভন দিয়ে লাইনচ্যুত করা হচ্ছে।' এখন এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত, সন্ত্রাসী আর উগ্রবাদীদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো বিষয় নয়। সন্ত্রাসীর পরিচিয় সে সন্ত্রাসী। এবং সে সন্ত্রাসী। অতঃপর সে শুধু সন্ত্রাসীই। ব্যাকগ্রাউন্ড-ফ্রন্টগ্রাউন্ড বলে কিছু নেই।

সরকারি সূত্রকেই আমরা সঠিক ধরে নিচ্ছি। সন্ত্রাসীরা সবাই মারা পড়েছে, একজন ছাড়া। এখন নিশ্চয়ই এটা ভেবে বসে থাকা ঠিক হবে না যে, সারাদেশে এই সাতজনকেই তৈরি করা হয়েছিল, যাদের সবাইকে সাইজ করে ফেলা গেছে! অতি সঙ্গত বাস্তব চিন্তা থেকেই অনুমান করা দরকার এই ভাইরাস আরও কতজনের শরীরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে! তারা কারা হতে পারে! তারা কোথায় থাকতে পারে!

এই প্রশ্নের সঠিক জবাব সঠিকভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। অবশ্যই নষ্ট রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে করতে হবে। অবশ্যই মাইন্ডসেট ধারণাকে পেছনে ফেলে কাজ করতে হবে। বিশেষ কোনো ব্যক্তি, শ্রেণি বা প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করা যাবে না আবার ৫৬ হাজার বর্গমাইলের প্রতি ইঞ্চি মাটি এবং এভরি সিঙ্গেল ওয়ান নাগরিকের কাউকেই সন্দেহের বাইরে রাখা যাবে না। একদম প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে, আলেম-ওলামা, পির-ফকির থেকে নিয়ে রাস্তার ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাইকে সন্দেহভাজনের তালিকায় ভাবতে হবে। অবশ্য যারা কথায়-কথায়, যথায়-তথায় দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গি দেখে আসছে, তাদের প্রতি নজরটা একটু বেশি দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজন হলে তাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থায় বিশেষ বাহিনীর মাধ্যমে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, 'বল তোরা কী জানিস! যা যা জানিস বল। কোথায় কোথায় জঙ্গি আছে প্রমাণভিত্তিক বল। ঝেড়ে কাশ। তোরা তোদের পেটের ভেতর জঙ্গিদের এত খবর নিয়ে বসে আছিস আর দেশের আজ এই অবস্থা!'

তারা যদি সত্যি সত্যি উইথ ডকুমেন্ট কোনো তথ্য দিতে পারে, তাহলে সেভাবেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আর যদি 'হে হে' করে, 'হতে পারে, মনে হচ্ছে, ধারণা করছি'-টাইপ গাঁজাখুরি কথাবার্তা বলে, তাহলে এই ধারণার বাচ্চাদের আঙুল আর জিহ্বা কেটে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া দরকার। যাতে এর পরে আর ফালতু বকওয়াস করে বা লিখে দেশটাকে আরও বেশি অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে পাঠানোর সুযোগ না পায়।

আট

মূল দায়িত্বটা এখন ১৬ কোটি মানুষকেই নিতে হবে। সরকার, রাজনৈতিক দল, বুদ্ধির নষ্টজীবী, মিডিয়া, কারও উপরেই আর ভরসা করে বসে থাকা যাবে না। প্রত্যেক নাগরিককে এক-একজন পাহারাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। দেশের সব মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে সচেতন হয়ে যায়, তাহলে গুটি কতেক নষ্ট এর পরে আর কিছুই করার সুযোগ তৈরি করতে পারবে না। কারণ, তারা দেখবে তাদের একেকজনের ছায়ার সাথে হাজার লোকের নজরদারি। কিছুই করার ক্ষমতা থাকবে না তাদের।

নয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী!

মাননীয় খালেদা জিয়া!

মাননীয় রাজনীতিবিদগণ!

মাননীয় বুদ্ধিজীবী সুশীলগণ!

মাননীয় ওলামা-পির-মাশায়েখ!

মাননীয় মিডিয়াকর্মী ও সাংবাদিকগণ!

প্লিজ উপরের দিকে তাকান। আল্লাহকে স্মরণ করুন। অথবা স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তাকে। নিচের দিকে তাকান। মাটির গন্ধ শুকুন। রক্তের গন্ধ পাবেন। লাখ লাখ মানুষ রক্ত দিয়ে এ মাটি অবমুক্ত করে দিয়ে গেছে। রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। ভুলে যান সব। আল্লাহর ওয়াস্তে ভুলে যান পারস্পরিক জেদ-ক্লেদ। ভুলে যান পক্ষ-বিপক্ষ-প্রতিপক্ষ। মাটি বাঁচান। দেশ বাঁচান। দেশ বাঁচলে মানুষ বাঁচবে। ঝগড়া-ঝাটি পরেও করা যাবে।

ভুলে যাবেন না, ঘরে আগুন যেই লাগাক, পুড়ে মরতে হয় ঘরের ভেতরে থাকা সবাইকে। বাংলাদেশের গায়ে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। 'ফু' দেওয়ার চেষ্টাটা দয়া করে আর করবেন না। আগুন যদি লেগেই যায়; কে লাগিয়েছে সেটা কোনো কথা হবে না। পুড়ে বাঁচতে হবে পুরো দেশকে। যে বাঁচা হবে মরার চেয়েও কঠিন!

জঙ্গিবাদ দমনে জিরো টলারেন্স

আজ থেকে ৪৪ বছর আগে পাক হানাদারদের কবল থেকে স্বাধীন হয়েছিল আমার দেশের ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪১.৮৭৪ বর্গ কিলোমিটার মাটি। এখন আছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৯.৩৩৪ বর্গকিলোমিটার। দুই দশমিক ছয় চার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের বেরুবাড়িও আমাদের ছিল। তিনবিঘার মূলা ঝুলিয়ে দাদারা হজম করে নিয়েছে। আমরা বঙ্গোপসাগরে হিস্যা নিয়ে কোমরে আঁচল বেঁধে জেহাদ করতে চাই; কিন্তু রক্ত দিয়ে স্বাধীন করা মাটি পাহারা দিয়ে রাখতে পারি না। আমাদের এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের প্রধান দুই অঙ্গীকারের একটি হওয়া উচিত, 'চুক্তি অনুযায়ী আমরা আমাদের তিনবিঘার বাস্তব মালিকানা বুঝিয়ে দেবার কথা বলব আর না-হলে বেরুবাড়ি ফেরত চাইব। আর দ্বিতীয়টি হলো, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার মানে

২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। আমাদের মাথা উঁচু করে তাকাবার দিন। কিন্তু এই দিনেও বিশ্বের যেখানেই বাংলাদেশি, সবার মাথা নিচু হয়ে ছিল। জ্ঞাত কারণে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীদের আঘাতে বিক্ষত বাংলাদেশ। কারও মন ভালো নেই। কী হচ্ছে আর কেন হচ্ছে অথবা কী হতে যাচ্ছে—ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছে না কেউ! আহা স্বাধীনতা!

স্বাধীনতার মানে বুঝি শুধুই ভিন্নমত!
স্বাধীনতার মানে বুঝি রক্তঝরা পথ!
স্বাধীনতার মানে বুঝি আততায়ীর গুলি!
স্বাধীনতার মানে বুঝি উন্মাদীয় বুলি!
আবাল-বুড়ো দেশের মানুষ
সবাই আজি ক্ষুব্ধ,
এসব দেখার জন্যই কি
করেছিল যুদ্ধ!

স্বাধীনতার মানে হবে বুক ফুলিয়ে চলা
স্বাধীনতার মানে হবে মুক্তমনে বলা।
স্বাধীনতার মানে হবে জঙ্গিবিহীন দেশ
তবেই বলা যাবে স্বাধীন আমার বাংলাদেশ।

রাখাল ছেলে

বাংলাদেশে কিছুদিন পরপর একটা সিরিজ নাটক শুটিং হয়। নাটকের নাম 'জঙ্গি'। তিলকে মাঝেমধ্যে এমনভাবে তালগাছ বানানো হয় যে, অভিযানে জঙ্গিকে গুলি করে মেরে ফেলার ছবিসহ পত্রিকায় প্রকাশ করার পর মৃত জঙ্গি জীবিত হয়ে স্বশীরে পত্রিকা অফিসে বলে, 'বুঝলাম না! আমি জঙ্গি হলাম কীভাবে আর মারাইবা গেলাম কখন!'

বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসীদের অস্তিত্বের কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু বাইরের মাল খাওয়া জনবিচ্ছিন্ন বুদ্ধিভ্রষ্টারা যেভাবে দিনরাত জঙ্গি জঙ্গি তসবিহ জপে, দেশের অবস্থা ততটা নাজুক পর্যায়ে; সেটাও বিশ্বাস করি না। বাংলাদেশে ব্রেইনওয়াশড যেগুলো আছে, এদের সংখ্যা মনে হয় না এতবেশি হবে, যাদেরকে আঙুলে টিপে মেরে ফেলা যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশের একশ্রেণির বুদ্ধিভ্রষ্টা দালাল এগুলোকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে হুজুগে মিডিয়ার কল্যাণে এমনভাবে প্রচার করে যে, মনে হয় যেন বাংলাদেশ সন্ত্রাসীদের একটি অভয়ারণ্য হয়ে গেছে!

দেশকে অশুভ শক্তির বিচরণক্ষেত্র হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারকে প্রথমেই যা করতে হবে তা হচ্ছে, এই বুদ্ধিভ্রষ্টাদের ধরে ধরে মুখ থেকে জিব এবং হাত থেকে আঙুল কেটে ফেলা। বাবা তোরা খা আর ঘুমা। ঘুমিয়ে জঙ্গি স্বপ্ন দেখতে থাক। কিন্তু জেগে উঠে স্বপ্নের কথা টেলিভিশনে বলার বা কাগজে লেখার দরকার নাই। তোদের স্বপ্নের দোষ-ত্রুটি তোরা তোদের বাথরুমে গিয়েই পরিষ্কার কর।

...

রাখাল বালকের গল্পটি সবাই জানেন। 'বাঘ আসিয়াছে! বাঘ আসিয়াছে'—বলে নিয়মিত মশকারা করতো সে। লোকজন লাঠি-সোটা নিয়ে দৌড়ে আসার পর হা হা করে হাসত। একদিন যখন সত্যি সত্যিই বাঘ এসে আক্রমণ করল, সেদিনও চিল্লাল সে। কিন্তু সেদিন আর কেউ আসেনি!

বোদ্ধামহলের ধারণা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় 'জঙ্গি জঙ্গি' নাটক মাঝেমধ্যেই প্রদর্শিত হয়। কিন্তু সিলেটে এবারের ঘটনা নাটক নয়; এটি একটি রিয়েলিটি শো। কিন্তু ওই যে! বাঘ আসিয়াছে! বাঘ আসিয়াছে! যখন বাঘ আসে নাই, তখন 'আসিয়াছে' বলিয়া ফাজলামো করিলে আর সত্যি সত্যি একদিন বাঘ আসিয়া গেলে কাকে কী বলার থাকে!

গবেষণাবাজি

'বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো সুরক্ষিত রাষ্ট্রাগারে আগুন, সিলেট শিববাড়িতে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে জঙ্গিদের মরণখেলা'—অনেকেই একটার সাথে আরেকটার যোগসূত্র খুঁজে নিতে চেষ্টা করছেন। তাদের ধারণায় যৌক্তিকতা থাকতে পারে। কিন্তু এখন সময় যুক্তির ঊর্ধ্বে উঠে মাটি ও মানুষকে বাঁচানো।

'দেশে সত্যি সত্যি জঙ্গি আছে, তারা মারল, মরল' অথবা 'দেশে একটাও জঙ্গি নেই, সব সরকারের সাজানো নাটক'... আমাদের গবেষকমণ্ডলী এই দুই ধারায় বিভক্ত। রোম পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে আর নীরুমনিরা ছুটছেন বাশিওলার সন্ধানে! আরে বাবা! রোম আগে বাঁচুক না। বাঁশিওলার খোঁজ তো পরেও করা যাবে।

সরকার থেকে প্রায়ই শোনা যায়, 'জঙ্গি দমনে জিরো টলারেন্স নীতি ফলো করা হবে।' আসলে জঙ্গি 'দমন' নয়; বলা দরকার ছিল জঙ্গি 'নির্মূল'। বার বার দমানো হয় দেখেই খবিসগুলোর লেজ থেকে যায়। আবার শিকড় গজায়। আর জিরো টলারেন্সটা যতটা না জঙ্গি নির্মূলের জন্য দরকার, তারচে অনেক বেশি করে দরকার মানসিকতায়। আর দরকার রাজনীতিবিদদের জন্য। ওবায়দুল কাদের বললেন, 'অপশক্তির পৃষ্ঠপোষক বিএনপি', মির্জা ফখরুল যদি বলেন, 'সরকারই জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে।' তাঁরা যদি মুখে লাগাম না দেন আর দেশের মানুষ দুজনের কথাই বিশ্বাস করে একবাক্যে দাবি ওঠায়, বাংলাদেশে আওয়ামীলীগ-বিএনপি নিষিদ্ধ চাই। কারণ, এগুলো জঙ্গি সংগঠন। বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি সংগঠনের স্থান নেই, তখন কী হবে?

তাহলে উপায়?

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা দেশের সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয়। সরকারের দ্বারাও না। কিছু যদি করার ক্ষমতা কারও থাকে, তাহলে সেটা একমাত্র আমজনতারই আছে। হুজুররা আবার ফাতওয়া দিয়েন না আমার উপরে। আমজনতা আল্লাহর সাহায্য নিয়ে নামবে। নো টেনশন।

এই যে বললাম, সরকার বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষে সন্ত্রাস বা জঙ্গি নির্মূল সম্ভব নয়; এটা বলবার জন্য খুব একটা ভাবতে হয় না। প্রথমে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কথা বলি। তাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না। বলছি না তাদের ক্ষমতা নেই। বলছি তাদের পক্ষে সম্ভব না। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার জন্য ফ্রি হ্যান্ড অপারেশনের পারমিশান দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা কাজ শেষ করে এসে বলবেন, 'খেল খতম'। তারপর সারাদেশে এমন একটি ইঁদুরের গর্তও খুঁজে মিলবে না, যেখানে কোনো সন্ত্রাসী বা জঙ্গি আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু এটা কখনো হবে না। কোনো সরকারই এটা করবে না। অ্যান্টি ভাইরাস বিক্রির জন্যই ভাইরাস জন্ম দিতে হয়। বাঁচিয়ে রাখা লাগে। আইন-শৃংখলা বাহিনীর সামনে অদৃশ্য একটা তালিকা থাকে। যেখানে বলা থাকে কাকে ধরা যাবে আর কাকে যাবে না। কী করে সম্ভব!

সরকারের দ্বারা সম্ভব হবে না; কারণ, সরকারকেও জবাবদিহি করতে হয়। সরকারের জবাবদিহি করার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলা হয় জনগণ। রাজনীতিতে এই মিথ্যা কথাটি চরম একটি সত্য কথা। দৃশ্যকাব্যের আড়ালে থাকেন আসল গুরু। গণতান্ত্রিক ভাষায় বললে ক্ষমতার চাবিওলা বলা যায়। নাটাই থাকে তার হাতে। কর্তার নির্দেশে হয় কর্ম। আমরা মর্ম না-বুঝে লাফ দিই। যারা বুঝেন, তাঁরা একা একা গান ধরেন—

একখান চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া
চা-বি মা-ই-রা...

আসুন অঙ্কের খাতা নিয়ে বসি

বাংলাদেশের আয়তন কত?

৫৬ হাজার বর্গমাইল তো!

৫৬ হাজার বর্গমাইল সমান ১, ৪৫, ০৩৯. ৩৩৪ বর্গ কিঃমিঃ।

১, ৪৫, ০৩৯. ৩৩৪ বর্গ কিঃমিঃ সমান ৪৭, ৫৭, ২৯, ০১৬ ফিট।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। ১ কোটি বাচ্চাকাচ্চাকে হিসাবের বাইরে রাখলে মানুষ ১৬ কোটি। তাহলে ৪৭, ৫৭, ২৯, ০১৬ ফিট ডিভাইডেড বাই ১৬ কোটি ইজ ইকুয়াল টু ২. ৯৭৩ বা ৩ ফিট (প্রায়)।

তাহলে মানেটা কী দাঁড়াল?

বাংলাদেশের মানুষ, দেশের সব মানুষ যদি সিদ্ধান্ত নেয়, আমার দেশ আমি আগাছামুক্ত করেই ছাড়তে চাই, তাহলে মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যাপার। দেশের সাধারণ মানুষ যদি প্রত্যেকে মাত্র তিনফিট জায়গার দায়িত্ব নেয়, তাহলে বাংলাদেশের জমিনে কোথাও জঙ্গি লুকানোর জায়গা থাকে না।

কী করতে হবে?

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল বলেছিলেন, 'অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা'। এই নামে তাঁর একটি বইও আছে। এবারের স্বাধীনতা দিবসের দিনটিতে পর্যন্ত দেশের মানুষ স্বাধীন ছিল না। জঙ্গি আতঙ্কে কেটেছে বাংলাদেশের দিনরাত। ৩০ লাখ আত্মত্যাগ তো এভাবে কলুষিত হতে পারে না। যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা নিলে সহজেই সম্ভব বাংলাদেশকে সেই অবস্থানে নিয়ে যাওয়া; যার স্বপ্ন দেখেছিল ৭ কোটি বাঙালি।

বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের কর্তাব্যক্তি যদি তাঁর পরিবারের সকল সদস্যের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সব খবর বের করে ফেলতে চান, বাড়িওলারা যদি তাঁর ভাড়াটে ঘর এবং ভাড়াটিয়ার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করেন, তাহলে বাংলাদেশের কোথাও কি আর নষ্টদের লুকিয়ে থাকার জায়গা থাকে?

সুতরাং

দেশে সরকার আছে। থাকুক সরকার।

দেশে রাজনৈতিক দল আছে। থাকুক তাঁরা।

পুলিশ, র‍্যাব আর চিতা-কোবরা আছে। থাকুক।

সেনাবাহিনী আছে। থাকুক সবাই। যার যার মতো করে কাজ করুক। কিন্তু মূল দায়িত্বটা এখন সাধারণ জনগণকেই পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাকে বাঁচানোর জন্য অন্য কারও অপেক্ষায় বসে থাকা আত্মহত্যার মেন্টালিটি। নিজের বাঁচার চেষ্টা নিজেকেই করতে হয়। মানুষ যখন তাঁর চেষ্টার শেষ করে, আল্লাহর সাহায্যের সূচনাটা হয় সেখান থেকে। হাত-পা গুটিয়ে আল্লাহর সাহায্যের জন্য বসে থাকবার কথা তো আল্লাহ কোথাও বলেননি!

ভণ্ডবাদ নিপাত যাক

শক্তিই যুক্তি, শক্তির সাথেই তাদের যাবতীয় চুক্তি। শক্তিই তাদের প্রথম এবং শেষ কথা; কারণ, তারা মগ। আমরাও এখন মগ হয়েছি। বাস করছি মগের মুল্লুকে! দেশটি এখন হীরক রাজার। চেতনার বটিকা খাও, হুজুগের গান গাও আর ঘুমাও জাতি! গুম হও, মরে যাও খুঁজে পাও, শীতলক্ষার বুকে...

হীরক রাজার দেশে তিনিই প্রথম তিনিই শেষ! তিনি যা বলেন সেটাই আইন, যা করেন সেটাই কানুন। উল্টা-পাল্টা করলেই গর্দান। তাল থেকে তিল হবার আগেই রাজামশাই কারবার খতম করে ফেলবার হুকুম জারি করতেন। প্রজারা তার ভয়ে তটস্থ থাকত।

আমরা আছি হীরক রাজার মগের মুল্লুকে। লাল ঘাম ছুটিয়ে, সর্বস্ব লুটিয়ে, হাত-পা গুটিয়ে, বেঁচে আছি আমরা, বেঁচে আছে দেশ! আত্মাকে হাতে নিয়ে বেঁচে আছে মানুষও।

ব্যথায় কুঁকড়ে আছে মুখ; তবু কিছু বলে না!

আতঙ্কে শুকিয়ে আছে বুক; তবু তারা নড়ে না!

যা কিছু ঘটার, চোখের সামনেই ঘটে; তারপরও নড়ে না!

এভাবেই দিন যায় রাত আসে; রাত যায় দিন আসে,

সবাই তাকিয়ে দেখে শীতলক্ষায় লাশ ভাসে,

তবুও জাগে না জাতি তারপরও জাগে না!

উদোম শরীরে চলে বেদম প্রহার আর বুলির জবাবে গুলি; তারপরও রাগে না!

দুই.

মাঝেমধ্যেই শোনা যায় বাংলাদেশের অমুক ইউনিভার্সিটিতে ধর্মীয় পোশাকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। শুনে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। মনে মনে ভাবি,

ভাগ্যিস, 'দাড়ি নিয়ে ক্লাসে যাওয়া যাবে না'—বলা হয়নি। বললে দাড়িওয়ালা ছাত্ররা মুশকিলে পড়ে যেত। দাড়ি তো আর ঘরে রেখে যাওয়ার জিনিস না! যদি বলা হতো, 'দাড়ি রাখতে হলে সৌদি আরব যাও'—কী করার ছিল?

ধর্মীয় মূল্যবোধ লালনকরা ছাত্রছাত্রীদের দেখা যায় আন্দোলন করছে টুপি, পাঞ্জাবি আর হিজাব পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারার অধিকারের জন্যে। লজ্জা লাগে নব্বই শতাংশ মুসলমানের দেশে টুপি পরার অধিকারের জন্য রাস্তায় নামতে হয় দেখে। আমার ভালো লাগত, আন্দোলন-টান্দোলন না করে শুধু এভাবে একটি ঘোষণা দিতে পারলে—'আমরা আমাদের পোশাক পরেই ক্লাস করব, পারলে ঠেকা'। কোনো ভিসি-টিসির মনে হয় না সাহস হতো ছাত্রদের জোর করে বের করে দেওয়ার।

অথবা,

ভিসিকে বুঝিয়ে বলা যেত, 'স্যার আপনি যা ভালো লাগে পরুন। প্যান্টের উপর আন্ডারওয়ার পরে সুপারম্যান হয়ে যান। মন চাইলে প্রথম জন্মদিনের পোশাক পরে ঘোরাঘুরি করেন। কোনো সমস্যা নাই। আমাদের পাঞ্জাবি ধরে টানাটানি করছেন কেন?'

তবুও কাজ না হলে হাতে কাঁঠাল পাতা ধরিয়ে দিয়ে বলা যেত, 'স্যার, আপনি এখানে কী করেন? আপনার তো কাঁঠালবাগানে ঘোরাঘুরি করবার কথা!'

তিন.

একের পর এক ব্লগার হত্যা করা হচ্ছে। সরকার কার্যত কিছুই করছে না। প্রতিটি ঘটনার পর সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে জ্যোতিষী মন্তব্য শুরু হয়। 'এটা অমুকের কাজ, তমুকের কাণ্ড! এটা অমুক নেতার ইন্ধনে হয়েছে, তমুক নেত্রীর ইশারায়।' আরে বাবা! জানা-ই যদি থাকে, ধরো না কেন? এখন পর্যন্ত একজন ব্লগার হত্যারও কি বিচার করা গেল? তাহলে যারা খুন করেছে, দায়ী কি শুধু তারাই? সরকারের দায় নেই?

বখাটে ব্লগাররা ধর্ম নিয়ে আজেবাজে কথা বলল। উত্তপ্ত হলো দেশ, দেশের মানুষ। সরকার করল কী? বখাটেগুলোকে জার্মানি-সুইজারল্যান্ডের টিকেট ধরিয়ে দিলো। এখন ধর্ম নিয়ে উল্টা-পাল্টা বললে বা আল্লাহকে গালিগালাজ করে লিখে লাইম লাইটে আসতে পারলে শাস্তি যদি হয় উন্নত বিশ্বের টিকেট, তবে মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের ছেলেরা তো উৎসাহী হতেই পারে। দোষ কি শুধুই তাদের?

মুক্তচিন্তা মানে ধর্ম আক্রমণ নয়। যারাই যেকোনো ধর্ম নিয়ে বাজে কথা বলবে, তাদেরকে ধরে বিচারের মুখোমুখি করলে আর কি কেউ নতুন করে বকওয়াস করবার সাহস পেত? একজন ব্লগারকে হত্যা করার পর খুনিকে ধরে বিচারের আওতায় আনা হলে কি এভাবে একজনের পর একজন ব্লগারকে খুন হতে হতো? তাহলে, ধর্মানুভূতিতে আঘাত করলে ছাড় না দেওয়ার ঘোষণা অথবা ৫৭ ধারা; এগুলোকে চক্ষু-ধোলাই ছাড়া আর কি কিছু বলার থাকে?

ইসলাম আইন হাতে তুলে নিয়ে কাউকে হত্যা করার অধিকার দেয়নি। যে যাই করুক, বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং তেমন হত্যাকাণ্ডে উল্লসিত হওয়াকে ইসলাম কখনো ইসলামিক কর্মকাণ্ড বলে স্বীকার করে না।

চার.

কোনো জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁচতে পারে না যতক্ষণ না মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়। মানুষ বাঁচতে চায় কিন্তু মরতে চায় না! মৃত্যুর শপথ নেওয়া জাতিকে দমানোর কেউ নেই। যখন যে যুগেই মানুষ হয়ে গেছে খোলসবন্দি, তখনই শাসকশ্রেণি শুরু করেছে ফন্দি। মসনদের মাদকতা সাধক-সন্ন্যাসীকেও বিনাশী বিন্যাসে আচ্ছন্ন করে তুলে। এ বড় কঠিন প্রেম। যে প্রেমের কোপানলে দেশপ্রেম উবে যায়, মনুষ্যত্ব ডুবে যায়। পশুতে-মানুষে যত ব্যবধান থাকবার, সেটিও থাকে না আর! শরীরে চামড়া থাকে আত্মায় থাকে না। যে কারণে তাদের চোখে আর মানুষ লাগে না। লাশের হিসাবও আর মিলে না।

এরা আগেও ছিল, এতটা তো ছিল না। এবার তবে কোন সাহসে এতটা জল্লাদ হলো? কারণটা অজানা নয়; দেশবাসী সব জানে। সীমান্তিক শকুনগুলো, লালাঝরা কুকুরেরা, জন্মান্ধিক বিবেক বন্ধ্যা খুঁজে পেয়েছে সন্ধ্যামালতি। ঘোড়ারা ভালোই জানে সামনে ঝুলিয়ে মূলা কীভাবে গাধাকে তারা (গাধীও পড়া যাবে) পা চাটা খচ্চর মতো, অসভ্য-ইতর করে ব্যবহার করা যায়। তা-ই করে চলছে তারা, মাঝখানে মরছে মানুষ; ভাসছে মানুষ লাওয়ারিশ হয়ে!

পাঁচ.

আমরা মানুষ। আমরা সবাই 'আজ'-এ আছি। কাল কী হবে কেউ জানি না। হতে পারে ভুল, হতে পারে শুদ্ধ। সেই দিন আর বেশি দূরে নয়, দেয়ালপিঠা মানুষগুলো বেরিয়ে যাবে আবাস ছেড়ে, ছেলে-বুড়োসুদ্ধ। মরতে মরতে ভাববে মানুষ মরব যখন লড়েই মরি।

ফেরাউনির উৎসমূলে আজকে যারা, আগেও ছিল। তাদের উপর আস্থা রেখে পার পায়নি পূর্বসূরী। বেইমানিটা স্বভাব তাদের বাপ-দাদাকেও ছাড় দেয়নি। আগামীতেও ছাড় যে দেবে, কোন ভরসা কিসের আশা? হনুমান যে জাতির হর্তা, মোদীমার্কা শাসনকর্তা, অনুমান করা যায় প্রভুত্ব ফলাবে যখন, যেভাবে যা কথা করা; দেশের মানুষ আর ঘরে বসে রবে না! ৩৪ কোটি লোক যখন দেবে তাড়া, তখতে তাউসে যখন দ্রোহের আগুন জ্বালাবে, ইনু-বিনু-চিনুরা তখন জান নিয়ে পালাবে! পাশে তখন থাকবে না কেউ, যেমনি করে দৌড়েছিল আশির দশক মধ্যভাগে!

মানুষ তো আজ শীতলক্ষায় ভাসে, দেশের নদী, স্বচ্চ পানি। সময় যখন বিগড়ে যাবে, দেশের নদও মুখ ফেরাবে, বঙ্গোপসাগরই হবে কিশতির ঠিকানা। আগামীর পৃথিবীর ইতিহাসের ছাত্ররা, উৎসুখ মেজাজে তারা পাঠ করবে ইতিহাস; 'এক দেশে এক রাণী ছিল...'

তাহলে কী করতে হবে? নীরবে হজম করে যাওয়া?

অনেক কিছুই করা যায়।

ক. ওদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা।

খ. ওদের সাথে মুসলমানরা বিয়েশাদির সম্পর্ক ত্যাগ করা। অর্থাৎ, ওদের মেয়েকে ছেলের জন্য না আনা, ছেলের জন্য মেয়ে না দেওয়া।

... প্রথম দুইটা আর শেষটা বলে দিলাম।। মধ্যেখানে আরও কী কী করা যায়, মুসলমানদের বড় নেতারা ভেবে বের করুন। না পারলে ছোটদের কাছে হাত পাতুন।

গ. ওরা মরলে জানাজায় শরিক না হওয়া।

প্রতি সপ্তাহে ইচ্ছাকরেই একটা করে ইতরামি বাক্য বলবে আর আমরা কামকাজ বাদ দিয়ে ওদের নামে স্লোগান দেবো—এভাবে আর কত? এরা তো ঠিক এটাই চায়, আমরা যা করি। কেন করি? কতদিন করে যাব?

ছয়.

বায়তুল মুকাররাম সামনে আসার পর তাঁর শরীর থেকে ভু ভুর করে মেশকে আম্বরের গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে। আমরা এখন তাকে নিয়ে পদ্মপাতার গদ্য রচনা করছি। এই কিছুদিন আগেও যিনি ছিলেন গোদের উপর বিষফোঁড়া, সেই তিনিই এখন একজিমার মলম। তাঁর মাধ্যমেই আমরা এখন একজিমা-

বিখাউজের উপশম চাই! তাঁর মাধ্যমে বায়তুল মুকাররাম জয় করতে চাই। এটা করে ফেলতে পারলে ফতেহ মক্কা করে ফেলব; ভাবসাব আমাদের সেরকমই।

আসলে আমরা যে যাই বলি আর যে ভঙ্গিতেই বলি, আবেগকে ছাড়তে চাইলেও আবেগ আমাদের ছাড়ে না। মতের একটু অমিল হলেই নাস্তিক বানিয়ে ছাড়ি আবার সেই তাকেই মাথায় তুলে নাচি! মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ যা ছিলেন, তাই ছিলেন এবং তাই আছেন। তিনি বদলাননি, আমরা বদলাই। তাঁকে জাতীয় মসজিদের মিম্বরে দেখতে চাই কারণ; বাকি দুজন মাজারপন্থী। তাঁরা খতিব হলে বায়তুল মুকাররাম চলে যাবে বিদাতিদের হাতে!

যদিও আমাদের চাওয়া-না চাওয়ায় খতিব নিয়োগে মোটেও প্রভাব ফেলছে না কিন্তু প্রভাব ফেলছে আমাদের মানসিকতায়। চিন্তার দৈন্যতা থেকে মুক্ত হতে পারছি না আমরা। অবশ্য চাইছি কি না—সেটাই হলো মূল প্রশ্ন!

আত্মবিস্মৃতি

[ওলামায়ে কেরামের বরকতি কদমে]

বছর দুয়েক আগে বাংলাদেশে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি মূল্যবোধের ঠিকাদার সংস্থা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড হজরত তারেক রহমান দামাত বারাকাতুহুম ধর্মীয় রাজনীতি ব্যাপারে উনার মহামূল্যবান বাণীটি উদ্‌গিরণ করার পর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম সঙ্গেরসাথি ইসলামি মূল্যবোধওলাদের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য। হতাশ হলাম আমি। দায়সারা গোছের মিনমিনে কিছু নিন্দা বিবৃতি ছাড়া তেমন কোনো ভাবান্তর দৃশ্যমান হলো না। একটি প্রশ্নই মাথার ভেতর ঘুরঘুর করতে লাগল। ইসলামি রাজনীতি আর ইসলাম নিয়ে রাজনীতির মাঝে কি আদৌ কোনো ব্যবধান আছে! ঠিক করেছিলাম ইসলামি রাজনীতির সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বস্তুকে সামনে পেলে জিজ্ঞেস করব, 'মূল্যবোধের তামাচাটা একটু জলদি হয়ে গেল কি না'!

ভোটের রাজনীতির কাছে ঐতিহ্য বিসর্জন দিলে, আসল ভুলে আঁচল খুঁজলে জিল্লতিই কপালে জোটে। কিচ্ছু করার নাই। কাকে দোষ দেবেন? ডাক দিয়েছেন আর মানুষ সাড়া দেয়নি, এমন তো হয়নি কখনো। মানুষের আর কীভাবে প্রমাণ করবার ছিল, 'ততক্ষণ আপনাদের সাথে আছি যতক্ষণ আপনারা আপনাদের সাথে থাকছেন'। মানুষকে ধরে রাখতে না জানলে অথবা নিজেরাই অন্যের দয়ার দাসত্ব গ্রহণ করে নিলে আর মাঝেমধ্যে এমন দু'একটা চড়-থাপ্পড় খেয়ে আসলে নীরবে হজম করা ছাড়া কী উপায়? আমার আব্বা বলতেন, 'ইলিম খাইলো নোটে আর ইমান খাইলো ভোটে'। বাড়িয়ে বলতেন না মনে হয়।

তাঁরা ইসলামি রাজনীতি করেন। তাঁরা আওয়ামীলীগ-বিএনপির সাথে দহরম-মহরম করতে পারেন; কিন্তু নিজেরা নিজেদের সহ্য করতে পারেন না! আওয়ামীলীগ-বিএনপির জন্য ভালোবাসা আর স্বগোত্রীয়দের জন্য রসকসহীন ফাতওয়া! দুর্গতি পিছু ছাড়বে কেন!

তাঁরা এবং আপনারা

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে জেনেটিক সমস্যা ও সম্ভাবনা, ডিএনএ সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং তথ্যাদি বা আধুনিক বিজ্ঞানের স্পর্শকাতর কোনো ব্যাপারে(শুধুই) কুরআন-হাদিসে অভিজ্ঞ কোনো আলেম যখন কথা বলেন, পক্ষে কিংবা বিপক্ষে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন; সেটা যেমন বেমানান লাগে, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষিত লোকেরা মতামত ব্যক্ত করলে ঠিক ততটাই বেমানান ও হাস্যকর মনে হয়। যার যে সাবজেক্ট, তিনিই সে বিষয়ে বলাই তো ভালো।

আজকের বুদ্ধিজীবীরা কুরআন-হাদিসের কোনো বিষয় নিয়ে যখন মন্তব্য করেন, তখন ধান ভানারচে শিবের গীতই তাঁরা গাইতে থাকেন বেশি। ভাবি, বাবাজিরা আপন চরকায় তেল দেয় না কেন! যে জায়গা নাগালে মিলে না, সেখানটা নিয়ে ঘটাঘটি করতে না যাওয়াই তো ভালো ছিল। অজ্ঞতা ঢেকে রাখার সহজ ফর্মুলা হচ্ছে পরিপূর্ণ না-জানা বিষয়ে কম বলা এবং পারলে একবারেই না বলা।

আলেমসমাজের কেউ আমার কথায় মন খারাপ করলে আমি দুঃখিত। বলেছি আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো সূত্র নিয়ে আলেমরা মতামত দিলে বেমানান লাগে। বুঝেই বলেছি। লক্ষ করে দেখেছি, বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল বা তাফসির সম্মেলনে মুফাসসির হজরতগণ যখন বিজ্ঞান ও কুরআনের তুলনামূলক বিশ্লেষণধর্মী বক্তৃতা করেন, তখন বিজ্ঞানের খুটিনাটি যে তাদের আয়ত্বে নেই, মোটামুটি সেটিই প্রমাণ করে দেন। আর যেহেতু বক্তৃতা হয় একতরফা, তাই ভিন্নমতের জবাবের মুখোমুখি তাদের হতে হয় না। বিজ্ঞানের সূত্রাবলি শুদ্ধ হয়, অশুদ্ধও হয়। শুদ্ধ বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের মিল দেখাতে গিয়ে তাঁরা ঝাঁপ দেন আধুনিক বিজ্ঞানের জলাশয়ে। আর ভালো করে সাঁতার জানা না থাকার কারণে হাবুডুবু খেতে থাকেন সামান্য পানিতেই। বড় কষ্ট লাগে দেখে।

আমি জানি পরিশুদ্ধ বিজ্ঞানের এমন কোনো দিক নেই, যা মহাবিজ্ঞানী আল্লাহপাকের কুরআনে বিধৃত নেই। কিন্তু ভালোভাবে না জেনে বয়ান করে বেড়ালে তো সমস্যা। দরকার ছিল না। একজন আলেমের কাছে যা আছে, তার দাম তো আইনস্টাইনের সারা জীবনের অর্জনের চেয়েও হাজারগুণ বেশি। দরকার ছিল না। ওহির জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে থাকা ওলামায়ে কেরাম প্রচলিত পরিবর্তনশীল বস্তুবিজ্ঞানে সময় নষ্ট না করলেও সমস্যা ছিল না।

তবুও বলি

বললে তো আবার অনেক চেহারাই পানসে হয়ে যাবে। সর্বকালের জীবনবিধান কুরআনকে আলেমসমাজ যদি বর্তমানমুখী করে বুঝতে শুরু করতেন, দেখতেন, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিতে সবচাইতে এগিয়ে গেছেন তাঁরাই। কিন্তু সেটা তাঁরা করছেন না। আদৌ করবেন বলে মনেও হচ্ছে না।

আমার মনে হয় সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার আলেম সমাজ কী চান আর কেমন করে চান। আখেরাতের কামিয়াবির উপরই সন্তুষ্ট থাকবেন, নাকি কুরআনবিমুখ নষ্ট সমাজ পরিবর্তনে কুরআনের শিক্ষাকে তথ্য-প্রযুক্তির যুগের চাহিদামাফিক করে ছড়িয়ে দেবেন! করলে করার মতো করা, না করলে একেবারে না করা। ভালো না?

দায়ছাড়া দায়িত্ব

এখন একটি কথা বলি। কথাটি আরও অনেকবার বলেছি। তখনো স্বগোত্রীয়রা বকা দিয়েছেন। আজ না হয় আবার দিলেন। তখনই হজমে সমস্যা হয়নি আর এখন তো হজমশক্তি আরও বেড়েছে। হজমে সমস্যা হবে না।

এই যে জাফর ইকবাল, এই যে আবদুল গাফফার চৌধুরী, আনিসুল হক, মুনতাসির মামুন, আবেদ খান... এরা যতই উল্টা বলুন আর যা-ই পাল্টা লিখুন; তাদের এই গোমরাহি তো সেই উমরকে ছাড়িয়ে যায়নি, যে উমর খোলা তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন নবির মাথা কেটে ফেলার জন্য। সেই উমরকে দুআ এবং চেষ্টা করে 'হজরত উমর' বানানোর পর কী হয়েছিল অবস্থা! কোথায় পৌঁছে গিয়েছিল উমরের মর্যাদা! কত উচ্চতায় উঠে গিয়েছিল ইসলামের শান!

বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম কি জীবনেও কখনো উদ্যোগ নিয়েছেন জাফর ইকবালদের সাথে বসার! তাদের কথা শোনার! ইসলাম সম্বন্ধে তাদের কনফিউশন দূর করার! তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান করা হলে তাঁরা হয়তো বসতেন, হয়তো বসতেন না। বসতে রাজি হলে এবং কথা বলার পর হয়তো তাদের মধ্যে চেঞ্জ আসত, হয়তো না! কিন্তু ওলামায়ে কেরাম অন্তত আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে পারতেন, 'চেষ্টা করেছি মাবুদ। তাঁরা আমাদের ডাকে সাড়া দেয়নি'। অথবা তাঁরা আমাদের কথা আমলে নেয়নি। আমি জানি না মিছিল-মিটিং করে ফাঁসি চাওয়া এবং পত্রিকায় বিবৃতি পাঠিয়ে

প্রতিবাদ করার কথা বলে আল্লাহর কাছে পার পাওয়া যাবে কি না! মনে হয় না।

আমি তো মনে করি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন এদের ধরবেন, তখন এদের জন্য এদের আগে আলেম-ওলামাকেই ধরবেন। বলবেন, শুধু দূরে থেকে ফাতওয়া দিতে কে বলেছিল তোমাদের! কাছে গেলে না কেন? গিয়ে বুঝিয়ে বললে না কেন? ওরা কি ফেরাউন থেকেও কট্টর ছিল? আমি আল্লাহ তো ফেরাউনের মতো ডিয়ারিং পাবলিকের কাছে পর্যন্ত নবিকে দাওয়াত দিয়ে পাঠালাম। একজন মুসা অন্যজন হারুন। কেন! জানতে না তোমরা? কুরআনে তো আমি বলে দিলাম তাদের কথা।

> 'তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও (কারণ) সে বড়বেশি উদ্ধত হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বলো, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।[১২]

আলেমরা হলেন নায়েবে নবি। নায়েবের কাজ কী? পদস্থ যে কাজ করতেন অথবা করার কথা ছিল, সেটা আঞ্জাম দেওয়া। এ যুগের নায়েবদের কেউ কি কখনো উদ্যোগ নিয়েছেন এদের কাছে হেদায়াতের বাণী নিয়ে যাবার?

---

[১২] সুরা তাহা : ৪২-৪৪]

অসুস্থ কলম, আক্রান্ত জাতি

সুবিধাবাদী লেখক এবং বোবা শয়তানের গল্প

[একটি পুরনো লেখা। ভালো না লাগলে পড়ার দরকার নাই।]

তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে বানরের উপরে উঠার অঙ্কটি আমরা সবাই জানি। কিন্তু তৈলাক্ত কলমের কথা অনেকেই জানি না। জানা দরকার। সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলতে পারার জন্য এটা জানা জরুরি। একটি কলমের ক্ষমতা অনেক। একটি তরবারির ক্ষমতাও কম না। অনেক রাজ্য জয় করেছে তরবারি। কিন্তু আমরা কি জানি, সেই উন্মুক্ত তরবারিগুলোর চালকের রক্তে উষ্ণতা তৈরি করার আসল কাজটি কিন্তু কলমই করেছে।

তবে তরবারি ও কলম—দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। তরবারির আঘাতে লাল রঙ বেরোয়। কলমের আঘাতে বেরোয় কালো। তরবারির রঙ বেরোয় ধ্বংস করার জন্য। কলমের কালো নূতন কিছু সৃষ্টি করে। কলম স্বপ্ন দেখায়, তরবারি স্বপ্নের জগতে গিয়ে হানা দেয়। সবমিলিয়ে বলা যায় একটি কলমের ক্ষমতা অনেক। ইস্পাতের সামান্য একটি তরবারিরচে তো অবশ্যই বেশি। এত ক্ষমতাবান একটি কলম যাদের রয়েছে, তাদের নাম লেখক। ইংরেজি Author। আজ আমরা লেখকদের গল্প করবো।

প্রাইমারি লেবেলের ছোট্ট কোনো বন্ধু যদি এই মুহূর্তের পাঠক হয়, তাহলে তার জন্য জানিয়ে রাখি। ইংরেজি Writer এবং Author দুটোর বাংলাই লেখক। তবে পার্থক্য আছে। কলম হাতে নিয়ে সাদা কাগজে যেকোনো কিছু লিখলেই তাকে Writer অর্থে লেখক বলা যাবে। যেমন Did Writer বা দলিল লেখক। Type writer বা টাইপ মেশিনে লেখক। এমনকি যারা পরীক্ষার খাতা লেখে, মামলার এফআইআর লেখে, দোকানের জমা-খরচ লেখে, রেস্টুরেন্টের বিল লেখে; রাইটার অর্থে তারাও লেখক। তবে আমাদের সমাজে আমরা যাদের লেখক বলি; অর্থাৎ, যাদের লেখা আমরা আগ্রহ নিয়ে পড়ি, আনন্দের কিছু পেলে দাঁত ফাঁক করে হাসি, কষ্টের কথায় হা-হুতাশ করি; অর্থাৎ, যারা গল্প, কবিতা, উপন্যাস লেখেন, পত্রিকায় ফিচার লেখেন, সাবজেক্টিভ বই-কিতাব লেখেন, এককথায় যাদের লেখার মূল হলো Creative faculty, সেই লেখকরা কিন্তু Writer না। তারা হলেন Author।

একজন লেখকের ক্ষমতা অনেক। একটি সমাজ বা রাষ্ট্রকে ওলট-পালট করে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে একজন লেখকের কলমের। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে

নজরুলের উপস্থিতি ছিল ভিন্ন অ্যাঙ্গেলে। নজরুল অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেননি। করেছেন কলম হাতে। 'লাথি মার ভাঙ্‌রে তালা, যত সব বন্দিশালা আগুন জ্বালা...' কবিতাগুলো থেকে যে গোলাবারুদ বের হতো, সেটা এ.কে ৪৭ রাইফেলেরচে কোনো অংশেই কম ছিল না। যুদ্ধবাজ, জুলুমবাজ, আধিপত্যবাদী গোষ্ঠী, সকল যুগের, অস্ত্রেরচে কলমকেই ভয় করেছে বেশি।

৪৭ পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকরা তাদের জন্য অন্যতম হুমকি হিশেবে চিহ্নিত করেছিল মাওলানা আবুল কালাম আজাদের কলমকে। তাঁকে জেলে পুরেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি তারা। পাহারাদার রাখা হয়েছিল, যাতে তাঁর কলমটি গর্জে উঠতে না পারে।

দুই.

একজন লেখকের সুবিধা, অসুবিধা এবং বে-সুবিধা—তিন দিকই আছে। সুবিধাবাদী লেখকদের কথা জানতে হলে প্রথমে এগুলো জানা দরকার। বেসুবিধা শব্দটি যাদের খট্‌কায় ফেলে দিয়েছে, তাদের জন্য বলি। বাংলা ব্যাকরণে এই শব্দটির প্রয়োজন আছে। অন্তত আমি আমার জীবনে সেটার উপস্থিতি টের পেয়েছি।

লেখকের সুবিধা হচ্ছে, মনের কথা সময় নিয়ে গুছিয়ে বলতে পারেন। মনের ঈশানে জমে থাকা কালো মেঘগুলো নীরবে বসে বের করে দিয়ে হালকা হতে পারেন। লেখকের সবচে বড় সুবিধা হলো তারা স্বপ্ন দেখতে পারেন। স্বপ্ন দেখাতেও পারেন। বর্তমানে বসে ভবিষ্যতের ব্যালকনিতে চলে যেতে পারেন স্বপ্নের হাত ধরে। পাঠককেও নিয়ে যেতে পারেন সেখানে।

লেখকের অসুবিধার শেষ নেই। মত প্রকাশের স্বাধীনতা হচ্ছে একজন লেখকের প্রথম পছন্দ, প্রথম প্রাপ্য। অন্যের অধিকারে বা অনুভূতিতে আঘাত না করে স্বাধীনভাবে লিখতে পারার সুযোগ থাকা উচিৎ একজন লেখকের। কিন্তু আমাদের সমাজে আমরা কী দেখি? মত প্রকাশের স্বাধীনতা শুধু কিতাবেই আছে; বাস্তবে নেই। কথা বলতে হয় মেপে মেপে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ওজন করে। রাষ্ট্রীয় হর্তাকর্তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলার আগে সম্ভাব্য সকল প্রকার ঝুঁকির আশঙ্কা মাথায় রাখতে হয়। আমার দেশের কর্তাব্যক্তিরা ভিন্নমত হজম করে অভ্যস্ত না। তাদের পছন্দ তোষামোদ। দ্বীনি কোনো মাসআলা নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা জাগলে মাথায় রাখতে হয় বুজুর্গানে দীনের মখতলিফ নজরিয়্যাতের বিষয়টিও।

লেখকের অন্যতম আরেকটি অসুবিধা হলো ক্ষেত্র সংকট। লেখা প্রকাশের পরিধি সংকট। একজন নবীন লেখক; অসম্ভব প্রতিভা রয়েছে তার। সে সেটাকে খুব বেশিদিন লালন করতে পারছে না। প্রথম কারণ, পরিচর্যা পাচ্ছে না। দ্বিতীয় কারণ, বিকশিত হওয়ার জায়গা ও সুযোগ পাচ্ছে না। অবশ্য, ক্ষেত্র সংকটের এই ব্যাপারটি হালে ফেসবুকের কল্যাণে কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে। ছেলেরা এখন ইচ্ছামত লিখতে পারছে। অনেক কষ্ট করে একটা লেখা কমপোজ করে পত্রিকায় পাঠিয়ে সম্পাদকের দয়ার উপর ভরসা করে বসে থাকতে হচ্ছে না। অনলাইনে লেখার সবচে ভালো দিক হলো, ইন্সট্যান্ট প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে; যা একজন লেখকের জন্য সবচে বেশি প্রয়োজন।

সুবিধা অর্থ সহজ উপায়। উপায় যদি সহজ না হয়ে একটু কঠিন হয়, তাহলে তার নাম অসুবিধা। আর উপায়টি যদি হয় ঝুঁকিপূর্ণ, আশঙ্কাজনক; তাহলে সেটাকে তো অসুবিধা বলে হালকা করে দেখা যাবে না। তাহলে কী বলবেন? আমি এর নাম দিলাম বেসুবিধা। বেসুবিধার উদাহরণ দিচ্ছি—

দৈনিক *আমার দেশ* পত্রিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-তনয় জয় এবং জ্বালানী উপদেষ্টা তৌফিক এলাহির বিরুদ্ধে পেট্রোবাংলা থেকে উঠানো দুর্নীতির অভিযোগের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনটি লেখার কারণে প্রতিবেদকের উপর সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল। একমাস সাতদিন জেলও খাটতে হয়েছিল তাকে। ফেনীর একসময়ের দাপুটে আওয়ামীলীগ নেতা জয়নাল হাজারীর স্টিয়ারিং কমিটি সাংবাদিক টিপুর পা ভেঙে দিয়েছিল। এগুলোকে কী বলবেন? বেসুবিধা না বলে উপায় আছে?

লেখালেখির কারণে শারীরিক আঘাত আসুক বা না আসুক, মানসিক আঘাত আসবেই। অতি সম্প্রতি হেফাজত এবং শাপলা নিয়ে নিউট্রাল অ্যাঙ্গেল থেকে লেখা একটা বই, *বিশ্বাসের বহুবচন* (প্রথম প্রকাশ, ৫ মে ২০১৮) প্রকাশিত হবার পর যে পর্যায়ের গালিগালাজ এবং হুমকি-ধমকির শিকার হতে হয়েছিল আমাকে, তার সাক্ষী তো অনলাইনের হাজার হাজার পাঠক। এ ব্যাপারে এরচে বেশি আর কিছু বলতে চাই না। পানিতে কুপ মারতে চাই না, হাঁটুতো নিজেরই।

তিন

লেখালেখি চার প্রকারের হতে পারে বলেই আমার ধারণা।

১. স্রোতের অনুকূলে

২. স্রোতের প্রতিকূলে

৩. গতানুগতিক

৪. বাস্তবকেন্দ্রিক।

স্রোতের প্রতিকূলে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যারা লিখে যেতে পারেন, তাদের অন্য নাম বিদ্রোহী লেখক। স্রোতের অনুকূলে কলম ভাসিয়ে দিলে তাদের নাম হয় সুবিধাবাদী লেখক। এ ধরনের লেখকের লেখার অপর নাম তেল মারা। কোনো কিছুর চিন্তা বা তোয়াক্কা না করে যা সত্য, যা বিবেকসিদ্ধ, যা বাস্তব, তা-ই লিখে যাওয়ার নাম বাস্তবকেন্দ্রিক লেখা। আর সবগুলোর দরমিয়ানি রাস্তা এখতিয়ার করে লিখলে সেটা হয় গতানুগতিক লেখা।

আমার পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিবিন্যাস ভুলও হতে পারে। বিশ্বাস করতে হবে এমনও কোনো কথা নেই। আমি আমার কথা বললাম। গতানুগতিক লেখকদের উদাহরণ দেওয়া হয়নি। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। আলেম লেখকদের জন্য একটা; গায়রে আলেম সাধারণ লেখকদের জন্য একটা।

আলেম লেখকদের ম্যাক্সিমামই যেকোনো ধর্মীয় বিষয়ের গুরুত্ব, ফজিলত, তাৎপর্য ও আহম্মিয়তের বর্ণনানির্ভর লেখালেখিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। ওসব বিষয়ে খত্‌রা নেই। কিন্তু যেকোনো সরকার দ্বীনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলে সে বিষয়ে তাদের কলম নীরবতা পালন করাকেই নিরাপদ মনে করে। তাঁরা ইবাদত-নির্ভর বিষয়াদি নিয়ে লিখে লিখে বিরাট পুস্তক তৈরি করে ফেলেন; কিন্তু শরয়ি আহকামাত, মুনকারাত এবং স্পর্শকাতর হক কথা তাদের আর লেখা হয় না। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, কবি ফররুখ, নজরুল—এই নামগুলো হারিয়ে যায় তাদের মনতশির জেহেন থেকে!

গায়রে আলেম লেখকদের মধ্যে সুবিধাবাদী লেখকদের সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না। সময়ের নাজুকতা থাকে তাদের নখদর্পণে। স্রোতের অনুকূলেই চলে তাদের কলম। এরা হয় পরজীবী প্রকৃতির। এরা হয় কুকুরস্বভাবী। হাড়ের জন্য লেখে। মাড়ের জন্য লেখে। হাড় এবং মাড় পেলে তাদের পক্ষে যেকোনো কিছুই লেখা সম্ভব। তাদের কোনো সমস্যা হয় না; কারণ, বিবেক বলে কোনো বস্তু তাদের ১০০ হাতের ভেতরে এসে ঢুকতে পারে না। এরা হচ্ছে অতি নিম্নমানের জঘন্য রুচির সুবিধাবাদী লেখক।

সুবিধাবাদী লেখকের আরও একটি গ্রুপ আছে। এরা মূলত হাড় আর মাড়ের জন্য লেখে না। তবে তারা অসম্ভব প্রকৃতির ভীতু। ভীতুর ডিমে বসে তারা তা

দেয়। তাদের তলানীতে কিছু বিবেকও আছে। সেই বিবেকের মুখে থাকে স্লাইডিং দরজা। যে দরজা ধাক্কা দিয়ে একদিক থেকে অন্যদিকে সরানো যায়। সময় বুঝে তারা তাদের বিবেকের দরজাকে এদিক-ওদিক করে। অবস্থা সুবিধার না হলে দরজা বন্ধ করে দেয়। এরা তখন হয়ে যায় বোবা শয়তান। যে সত্য না বলে চুপ থাকে, তাকে বলা হয় বোবা শয়তান, আরবিতে আখ্‌রস শয়তান। শায়তানুন আখ্‌রাসুন।

আর যদি লিখেও কিছু, সেটা হয় জি হুজুর-টাইপ। অবিকল মানুষের মতো দেখতে এই প্রাণীগুলো সাপের মতো মেরুদণ্ডহীন। এরা সত্য বলে না, সত্য বুঝে না, সত্য দেখে না। এরা চতুষ্পাদ জন্তুরচেও নিকৃষ্ট। এই বিশেষণ আমি দিচ্ছি না। দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক...'তাদের অন্তর আছে কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু চোখ দিয়ে দেখতে চায় না, তাদের কানও আছে কিন্তু শুনতে চায় না। এরা চারপায়ী জন্তুর মতো; বরং তারচেও নিকৃষ্ট।' সুতরাং বিবেককে কাজে লাগিয়ে যে লেখক লিখবেন না বা লেখা থেকে বিরত থাকবেন; তাদের বিশেষণ দুটি। যার যেটা পছন্দ; গ্রহণ করতে পারেন।

১. চতুষ্পাদ জন্তু।

২. বোবা শয়তান।

চার

সুবিধাবাদী লেখক সকল পর্যায়েই আছেন। আলেম লেখকদের মধ্যেও এই সংখ্যা কম না। কোনো না কোনো ইসলামি রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা থাকলে তাঁর চোখে একধরনের পর্দা পড়ে যায়। কুরআনের ভাষায় যাকে বলা যায় গিশাওয়াহ্‌। তখন আর নিজ দলের দুর্বলতা লেখক মহোদয়ের চোখে পড়ে না। তাঁর রাজনৈতিক মুরব্বিদের মুখ থেকে কোনো ভুল কথা উচ্চারিত হলেও তিনি একশ একটা যুক্তি খাড়া করে প্রমাণ করতে চাইবেন, এরচে খাঁটি কোনো বাণী আল্লাহর জমিনে এর আগে আর কেউ দেয়নি!

ওই সকল রাজনৈতিক দলের বসন্তবাদী লেখকরা ভুলেও খুঁজে দেখেন না ইসলামি রাজনীতির পহেলা নম্বর শর্ত খুলুসিয়্যাত ও লিল্লাহিয়্যাত তাদের সংগঠনে আছে কি না! থাকলে দেখা যাচ্ছে না কেন! না থাকলে নেই কেন! ওই লেখকরা তাদের আলেম নেতার সামনে প্রয়োজনে নতজানু হয়েও জিজ্ঞেস করেন না, 'ঐক্য তাদের এতবেশি অপছন্দের জিনিস কেন'?

সাধারণ সুবিধাবাদী লেখকদের সবচে বেশি পরিচয় আমরা পেয়েছি গত তিন উদ্দিনের সরকারের সময়ে। আই.এম.এফ বা ইয়াজুদ্দিন, মইনুদ্দিন,

ফখরুদ্দিনের আমলে আমরা দেখেছি সুবিধাবাদ কাহাকে বলে, উহা কত প্রকার ও কী কী? দেশের নামি-দামি লেখকরা হাঁটুগালা দিয়ে শুরু করেছিলেন সেই সরকারের স্তুতি ও স্থাবকতা। তিন উদ্দিনের সরকারকে মোটামুটি ফেরেশতার পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে রীতিমত বন্দনায় মেতে উঠেছিলেন তারা। প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন কে কত বেশি হাসিনা-খালেদা বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরে সেই সরকারের নেক নজর কাড়তে পারেন।

সময় যখন পাল্টাল, সুবিধাবাদী সেই লেখকরাও খোলস পাল্টে ফেললেন। যে দুই নেত্রীকে তাদের লেখায় প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের সকল সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু এবং গণতন্ত্রের দুশমন; তাঁদেরকেই আবার উপস্থাপন করতে লাগলেন গণতন্ত্রের ক্যাপসুল হিশেবে। ভাবখানা এমন যে, এই দুই নেত্রীই গণতন্ত্রের দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটিকে খাঁদের কিনারা থেকে তুলে এনে জং ধরা ইঞ্জিনটি সার্ভিসিং করে সচল করে তুলেছেন। জাতিকে এজন্য কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে দুই নেত্রীকে কুর্নিশ করা দরকার।

এমন লেখকদের চিহ্নিত করে রাখা প্রয়োজন। জাতির জন্য এরা এক ধরনের হুমকি। সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য পাপ এরা।

পাঁচ

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে লেখালেখির ক্ষেত্রে আজকাল নাস্তিকতাকে প্রগতির সমার্থক শব্দ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন নাস্তিক বা তার কাছাকাছি যেতে না পারলে প্রগতিশীল লেখক হওয়া যাবে না! প্রগতির ঠিকাদার সেজে রাজধানীতে বসে যারা হাম্‌কে-তুম্‌কে করেন, তারা সংখ্যায় খুব কম; তবে প্রভাবশালী। নাস্তিকতাকে মাপকাটি বানিয়েই তারা লেখার ভালোমন্দ গুণাগুণ বিচার করেন। তবে তাদের অনেকেই নিজেকে নাস্তিক বলে প্রকাশ করেন না। বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো সরকারের মাথায় ইসলাম বিদ্বেষের পোকা ঢুকিয়ে দেওয়াই তাদের আসল কাজ। এই কাজটি না করলে তাদের পেটের ভাত হজম হয় না।

বাংলাদেশে আরও কিছু লেখক আছেন যারা ফেরাউন-স্বভাবী। ফেরাউনের নীতিতে বিশ্বাসী। কথাটি ব্যাখ্যা করছি। তার আগে আরও কিছু কথা জেনে নেওয়া দরকার। আমাদের সমাজে কিছু লেখক আছেন, যারা নাস্তিক তো নন, তবে নিজের ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। পাছে না আবার প্রগতির গায়ে দাগ লেগে যায়, এই ভয়ে।

আমার মনে পড়ছে দেশের জনপ্রিয় একজন লেখককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি কি আস্তিক?' ক্রিকেটের বাউন্সার থেকে গা বাঁচানোর মতো করে সুকৌশলে জবাব এড়িয়ে গেলেন তিনি। বললেন, 'বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়।'

কিছু লেখক আছেন যারা বছরে দুই ঈদের নামাজে হাজির হন। এই অর্থে তারা আল্লাহ বিশ্বাসী। কিন্তু তারা তাদের লেখালেখিতে আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করেন না? তারা বলেন ঈশ্বর!

এবার ফেরাউন-স্বভাবীদের কথা বলি। ফেরাউন আস্তিক ছিল না নাস্তিকও ছিল না। সে ছিল স্বস্তিক(!)। স্বস্তিক শব্দটি উৎপাদন করা হলো। স্রষ্টায় বিশ্বাসী হলে আস্তিক। না হলে নাস্তিক। কিন্তু নিজেকেই স্রষ্টা দাবি করলে তার জন্য কোনো না কোনো শব্দতো লাগবেই। স্বস্তিক শব্দটি আমার কাছে মন্দ মনে হয়নি।

ফেরাউন নিজেকেই খোদা বলে দাবি করতো। তাও যেন-তেন খোদা না, সবচে বড় খোদা। যদিও সেও জানত, সত্যিকারের আল্লাহ একজন ঠিকই আছেন। তবে প্রকাশ করতো না। কিন্তু কথায় আছে না, 'সাপ গর্তে ঢুকে সোজা হয়ে।' ফেরাউনও গর্তে ঢোকার সময় সোজা হতে চেয়েছিল। ইমান আনতে চেয়েছিল আল্লাহর উপর। সুযোগ দেওয়া হয়নি।

আমাদের দেশের ফেরাউন-স্বভাবী লেখকরাও বয়স হয়ে গেলে সুর নরম করে ফেলেন। ধীরে ধীরে যখন এগিয়ে চলেন বার্ধক্যের অন্ধকার সরুগলির পথ ধরে, মৃত্যুভয় যখন তাদের কাবু করে ফেলে; তখন খোদাদ্রোহী প্রগতির ভাঙ্গা রেকর্ড আর বাজান না। এমনকি তখন তাদের অনেককে নামাজ-রোজার দিকে বিশেষ নজর দিতেও দেখা যায়। প্রয়াত লেখক ড. হুমায়ুন আজাদের মতো স্বঘোষিত নাস্তিক লোকেরও পাশে বসে তার মেয়েকে আমরা সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করতে দেখেছি।

ছয়

আমাদের দেশে বেশ ওজনদার লেখক আছেন কিছু। যারা লিখনে, আচরণে যাই হোন; নামটি তাদের ইসলামি। মা-বাবার দেওয়া মুসলমান নামটি আর পরিবর্তন করেননি। তবে ইসলাম শব্দটি থেকেই গুনে গুনে ১০০ হাত দূরে থাকতে চেষ্টা করেন। তাদেরকে কিন্তু নাস্তিক লেখক বলা যাবে না। কেউ আল্লাহ বিশ্বাস না করলেও, খোদাদ্রোহী কথাবার্তা বললেও; তাকে আর যা-ই

বলা যাক, নাস্তিক বলা যায় না। নাস্তিক ওই ব্যক্তিকেই বলা যাবে, যে স্রষ্টা বলে কারও অস্তিত্বেই বিশ্বাসী না। দাউদ হায়দার, হুমায়ুন আজাদ, ড. আহমদ শরিফ, তসলিমা নাসরিনরা নাস্তিক। কারণ, তারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না বা করেন না। তারা স্বঘোষিত নাস্তিক।

পাঠকের বিভ্রান্ত হবার দরকার নাই। আমি তাদের ডিফেন্স করার চেষ্টা করছি না। আবেগের জগতের বাইরে এসে সত্য তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। যে যা, তাকে তো তাই বলা দরকার। বাড়িয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া আমড়াকে জোর করে জলপাই বানানোর জন্য টানা-হেচড়া করারইবা দরকার কী? আমড়াও তো আর কম টক না।

আমি যাদের কথা বলছি, তারা নাস্তিক না, তাহলে তারা কী?

ধোয়া তুলসীর পাতা?

খাঁটি দ্বীনদার?

আমি সেটা বলিনি। তাদেরও খাঁটি দ্বীনদার হতে কোনো আগ্রহ নেই। তারা কথা, কাজ ও লিখনিতে সরাসরি ইসলামের প্রতিপক্ষ। আলেম-ওলামা, মাদরাসা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বলা ও লেখা তাদের মূল কাজ। নিজেদের নাক কেটে হলেও ইসলামের যাত্রাপথে কাঁটা বিছাতে তারা বিকৃত আনন্দ পান। তারা তাদের এই আনন্দ একে অপরের সাথে শেয়ার করেন। চমৎকার একটি ইউনিটি কাজ করে তাদের মধ্যে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কেউ একজন কোনো কথা লিখলে বাকিরা সেটা পড়ে দেখার আগেই সেটাকে সাপোর্ট করে হারমোনিয়ামে একই সুর তুলেন। বলেন, 'তথাস্তু'।

তথাস্তু'র ব্যাখ্যা কি পাঠকের জানা আছে? জানা না থাকলে আপনার আশেপাশে থাকা কোনো হিন্দু ভাইয়ের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নিয়েন। সংক্ষেপ ঘটনা হলো, আমাদের হিন্দু ভাইজানরা যখন কোনো বিপদ-আপদে পড়েন বা তাদের কোনো কিছুর দরকার হয়, তখন তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। ভগবান তো আর এত অবসর থাকেন না। তিনি থাকেন মহাব্যস্ত। সমস্ত জগত দেখাশোনা করে রাখা তো কম কথা নয়। উপাসকের বিস্তারিত শোনার সময় থাকে না ভগবানের হাতে। তাই যেভাবে চাওয়া হয়, সেভাবেই তিনি কবুল করে নেন। তিনি শুধু বলেন 'তথাস্তু'। এর মানে, 'তাই হোক'। ব্যস, প্রার্থনা মঞ্জুর হয়ে গেল। বাম লেখকরাও চোখ বন্ধ করে একে অপরকে সমর্থন জানান 'তথাস্তু' কায়দায়।

সাত

দুই মাতাল সন্ধ্যোবেলা তর্ক করছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে একজন বলছিল, 'এটা সূর্য'। অন্যজন দাবি করছিল, 'এটা বড় কোনো তারকা হবে'। হঠাৎ সামনে এসে পড়া তৃতীয় এক লোককে তারা টলতে টলতে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ভাই, বলেন তো আকাশে ওইঠা কী? সূর্য না তারকা?' লোকটি জবাব দিলো, 'মাফ করবেন ভাই, আমি এই এলাকায় নতুন এসেছি!'

জবাব জানা আছে। জানা না থাকলে একটু খোঁজাখুঁজি করলেই জবাব পাওয়া যাবে। তারপরও যদি জবাব আসে প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে, গা বাঁচিয়ে; তাহলে তো হলো না। প্রশ্ন যেভাবে আসবে, জবাব দিতে লাগবে সেভাবেই। কোনো ইসলামবিদ্বেষী লেখক, ফুল নাস্তিক বা হাফ নাস্তিক; ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে কিছু লিখে ফেলল। আর তার 'ফাসি চাই' মিছিল দিয়ে মাঠ গরম করে তোলা হলো—এই নীতি কিন্তু পারফেক্ট না। কেউ মুখে বললে মুখে জবাব দিতে লাগবে। লিখে বললে লিখে। জবাব জানা না থাকলে জেনে নিতে হবে। এ পর্যন্ত এদেশে যারাই ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে লেখার দুঃসাহস ও দৃষ্টতা দেখিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে 'ফাসি চাই দিতে হবে' বলে চিৎকার করে করে গলা ভাঙ্গা ছাড়া আর তো কিছুই করা হতে দেখলাম না! তাদের যুক্তির জবাবে যুক্তি খাড়া করে প্রপার ওয়েতে জবাব লিখতে দেখলাম না কাউকে!

কেন?

যোগ্য লোকের অভাব?

বোঝার অভাব?

পরিকল্পনার?

বিষ ঢালা হচ্ছে গাছের গোঁড়ায়, ডালে ধরে ঝাঁকাঝাঁকি করে লাভ আছে?

চলুন, সকলে মিলে শুরু করি সুস্থ ধারার লেখকের খোঁজ করা। তাদের খুঁজে বের করি। তাদের নেতৃত্বে খুলে বসি লেখক তৈরির একটি পাঠশালা। আমরা সেখানে ভর্তি হই। প্রতিভা আছে, ক্ষমতা আছে, যোগ্যতা আছে কিছু লেখার, এমন সবাইকে সেখানে নিয়ে ভর্তি করিয়ে দিই। আগামী প্রজন্মকে কালচারাল বিপর্যয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা থেকে রক্ষা করার জন্য এই কাজটি করা বড় বেশি জরুরি।

পরিশিষ্ট

[এই অংশ না পড়লেও চলবে]

কী পড়ব কেন পড়ব

যারাই মোটামুটি লেখালেখির সাথে আছেন, তাদেরকে প্রায়ই এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। কালেভদ্রে আমাকেও যখন ছোটভাই-টাইপের কেউ এমন প্রশ্ন করে, আমি সোজাসাপ্টা জবাব দিই, 'বেশি বেশি পড়বা। যে যত ভালো পাঠক সে তত বড় লেখক।' বলা দরকার, এই বাক্যটিও যে আমি একজন বড় লেখকের কাছ থেকে শিখেছিলাম। সেই গল্প তো ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে।

আমি বুঝতে পারি, আমার জবাব শুনে প্রশ্নকারী সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে মোটামুটি ভারিক্কি-ধরণের কিছু কথাবার্তা আশা করেছিল। অসন্তোষ গোপন করার চেষ্টা করে তখন জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা কোন্ ধরণের বই পড়ব'?

আমি বলি, 'বাছ-বিচার নাই। সামনে যা পাইবা আর যা পড়তে ভালো লাগবে তাই পড়বা। লেখক বাছাই করার কিছু নাই। লেখক বড় নাকি ছোট, নামি নাকি কমদামি—সেটা কথা নয়। কথা হলো তোমার পড়তে ভালো লাগছে কি না? জরুরি না যে, যা পড়বা তাই বিশ্বাস করতে হবে। এমনও হতে পারে, লেখকের নীতি-আদর্শের সাথে তুমি একমত হতে পারছ না। সমস্যা নাই। তবুও তুমি তাঁর লেখা পড়তে পারো, যদি পড়তে ভালো লাগে।'

প্রয়াত হুমায়ুন আজাদের আদর্শের সাথে আমার দূরবর্তী কোনো সম্পর্কও ছিল না; কিন্তু আমি ছিলাম তাঁর বাংলা লেখার একজন ভালো পাঠক। আমাদের আশরাফ আলি থানবি, ইমাম গাজালি, আবুল হাসান আলি নদবির সাথে আদর্শিক মিল নেই; কিন্তু তাদের সব লেখা পড়েন এমন অনেক পাঠককে আমি ব্যক্তিগতভাবেও চিনি। আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে, আমরা লেখক হতে চাই; কিন্তু পাঠক হতে চাই না! যে কারণে লেখালেখি শুরু করার আগেই আমাদের মাঝে 'কী হনুরে' ভাব চলে আসে। লেখার উপযোগিতা আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে আসে।

কী পড়ব

আমার গুরুস্থানীয় লেখক, সিনিয়ার সাংবাদিক, গবেষক আবদুল হামিদ মানিক। দেশে থাকতে আমি প্রায়ই চলে যেতাম তাঁর কাছে। মাঝেমধ্যে তিনিও ডেকে নিয়ে যেতেন। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, কোন ধরণের লেখা পড়া দরকার?'

তিনি বললেন, 'চানাচুর কিনে খাও?'

আমি বললাম, 'জি'।

বললেন, 'আচ্ছা তোমাকে পানের উদাহরণই দিই। পান কিনে খাও যখন, দোকানি কাগজ দিয়ে পান মুড়িয়ে দেয় না?'

আমি বললাম, 'জি, দেয়'।

'ওরা কি সাদা কাগজ দিয়েই পানের খিলি বেঁধে দেয়?'

বললাম, 'না, বেশিরভাগ সময়েই পত্রিকা বা বই-পুস্তকের পাতা দিয়ে বেঁধে দেয়।

বললেন, 'পান খেয়ে পান বেঁধে দেওয়া সেই কাগজটিও পড়বে। হতে পারে সেখানে এমন কোনো লাইন তুমি পেয়ে যেতে পারো, যা অনেক খোঁজাখুঁজির পর খরিদ করা বইয়েও পাবে না!'

ফরমাবরদারি

আমরা যারা ছাইপাশ লিখি, তাদের কাছে অনেক লেখার ফরমায়েশ আসে। কিন্তু সমস্যাটা তখনই হয় যখন আবদারকারী সমস্যা বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না। লেখা চাওয়ার কমন একটা স্টাইল হলো এমন—

- ভাই, সুন্দর একটা লেখা চাই। নতুন একটা লেখা...'

যিনি চাইলেন, তাঁর অ্যাঙ্গেল থেকে অতি সাধারণ একটি চাওয়া; কিন্তু যিনি লিখবেন তার জন্য তো ভয়াবহ ব্যাপার। তার কাছে এমন আদেশ-নির্দেশ-অনুরোধ প্রায় প্রতিদিনই একটা-আধটা এসে জমা হয়। এখন তাকে চাহিদামাফিক সকলের আবদার মেটাতে হলে নাওয়া-খাওয়া, কাজকর্ম সব বাদ দিয়ে দিনে ২৬ ঘণ্টা শুধু লিখেই যেতে হবে। দুই ঘণ্টা ধার করা না হলে পোষাবে না।

তাহলে ঘটনা কী দাঁড়াল?

দেখা গেল একই লেখা অনেককে দিতে হচ্ছে শিরোনাম একটু পাল্টে, দু'চার লাইন এদিক-ওদিক করে। চেষ্টা করা হচ্ছে সবাইকে খুশি রাখতে। বড় মুখ করে একটা লেখাই তো চেয়েছে। আর তো কিছু না। কিন্তু এত আন্তরিকভাবে তাদের চাওয়াকে আমলে নেওয়ার পরও যতক্ষণ ফরমাবরদারি করা যায়, ততক্ষণ ভালো। কিন্তু অপারগতায় যখন কেউ কেউ অতি চমৎকার আচরণ করেন, তখন মেজাজটা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে যায়। অথচ, আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মেজাজ ঠিক রাখতে হয় এবং কীভাবে কীভাবে জানি থেকেও যায়।

কিছুদিন আগে ছোটভাই-টাইপ একজন কী একটা স্মারক বের করবে। তিনটি নাম দিয়ে আবদার করল এই নামগুলো ব্যবহার করে এক মাসের মধ্যে যেন একটা লেখা দিই। আমি বললাম 'আচ্ছা'। কিন্তু পেরেশানিতে থাকায় লেখাটি আর হয়ে উঠল না। সে প্রায় প্রতিদিনই ফেসবুকে একটা ইনবক্স করতে থাকল। আর তার মেসেজ যখনই আমার নজরে পড়ল, আমি বলতে থাকলাম, 'দিচ্ছি'। শেষ পর্যন্ত আর লিখতে পারিনি। তারপরের কাহিনি...

তার পরের কাহিনি অত্যন্ত শান্তির। ফেসবুকে তার বার্তাটা ছিল এমন—

> 'লেখা যখন শেষতক দিবেনই না, তাহলে তো প্রথমেই বলে দিতে পারতেন আমি পারব না। কিন্তু তা তো করলেনই না; বরং আশার আলো দেখালেন। নেটে আসাও বন্ধ রাখলেন...'

কথা থেকে মনে হচ্ছে না, টুকটাক লেখালেখি যারা করেন, তাদের একটাই কাজ থাকে—ফেসবুকে এসে স্ট্যাটাস মারা আর ইনবক্স চেক করা! অবশ্য এই অপরিপক্ক আচরণে আমি কিছু মনে করলাম না। প্রত্যাশা বেশি ছিল তার।

এবার বলি আসল খবর

ভদ্রলোক লেখা চেয়েছিলেন মাসখানেক আগে। আমি বলেছিলাম দেবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দিতে পারিনি। তিনি আমাকে বার্তা দিলেন এভাবে—

> 'আপনার কাছে একমাস আগে লেখা চাইলাম। মাঝখানে আরও কয়েকবার মনে করিয়েও দিলাম; কিন্তু আপনি লেখাটা দিলেন না। আপনি আপনার ওয়াদা রক্ষা করলেন না। ওয়াদা খেলাফ করা কাদের কাজ সেটা আর বললাম না। নিজেকে আপনি কী মনে করেন? বিরাট বড় লেখক হয়ে গেছেন? আপনার লেখা ছাড়া

আমাদের ম্যাগাজিন বের হবে না? এ আপনার ভুল ধারণা। আমরা ম্যাগাজিন বের করেছি। খুব সুন্দর হয়েছে। দুই অক্ষর লেখা শিখে গেছেন বলে এত অহংকার করা ভালো নয়।'

সঙ্গত কারণেই বেচারার এই গরম বয়ানের জবাবে কিছু বললাম না। দরকার ছিল না। লেখা চাইবার সময় কথার আগে ভাই পরে ভাই আর লেখা দিতে না পারলে শালাতে চলে যেতে পারে—এটাও বেশ পুরনো অভিজ্ঞতা।

ঘাট পেরোলে...

আরেকটি সচরাচর অভিজ্ঞতার কথা বলি। এটি অবশ্য তিক্ত অভিজ্ঞতা না। উপভোগ্য ছিল। বোধকরি প্রায় সকল লেখকের বেলায়ই এমন ঘটে। দেশে থাকতে অনেকেই লেখা চাইত। কেউ সরাসরি এসে দেখা করে, পরিচিতি গাঢ়ো হলে ফোনেই। লেখা দেওয়ার আগে একাধিকবার তাগাদা দিত, আশেপাশে হলে আরও এক দু'বার দেখাও করতো। কিন্তু সেই তারাই লেখা নেওয়ার পর লেখককে যে এসে একটা সৌজন্য কপি দিয়ে যাবে—সেই সময়টুকু আর করে উঠতে পারত না।

ও বন্ধু কেমন আছো

এবার সাম্প্রতিক একটি মজার অভিজ্ঞতা শেয়ার করি। ফেসবুক ইনবক্স কথোপকথন :

বলল, 'বন্ধু কেমন আছো?'

বললাম, 'ভালো'।

বলল, 'তুমার লেকা আমার ভালো লাগে।'

বললাম, 'আরও ভালো'।

- আমার বইনের বিয়ে হবে, শারক বের করব।

- খুবই মহৎ উদ্যোগ।

- তুমি তাকে নিয়া একটা লেকা দাও।

- আমি কীভাবে তাকে নিয়ে লেকা দিব! আমি কি তাকে চিনি নাকি!

- সে আপনাকে চিনে।

আমি ঢোক গিললাম আর মনে মনে তিনবার বললাম—
'ইয়া আজিজু
ইয়া আজিজু
ইয়া আজিজু।'

তারপর বললাম, 'নাম কী তোমার বইনের? আর আমাকেই-বা কীভাবে চেনে?'

- সে আপনার সব বই পড়েছে। তার নাম...

টের পেলাম বুকের উপর থেকে ১২০ পাউন্ড ওজনের একটা পাথর নেমে যাচ্ছে। মুখভরে একদলা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল একসাথে। বললাম, 'বুঝতে পেরেছি'।

- তাহলে লেকা দিয়ো।

- তাহলে কীভাবে লেকা দিব? 'জয়তেরা বেগম আমার ভালো একজন পাঠক। সে আমার সব বই পড়ে ফেলেছে, তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখময় হোক'... এর বাইরে তো কথা খুঁজে পাব না'।

- বানিয়ে বানিয়ে লিকে দিবে। তুমি তাকে ভালো করে চিনো। সে খুব ভালো মেয়ে—এই রকম। লেককরা তো কত মিছা গল্প বানাতে পারে।

আমার আর সন্দেহ রইল না, ছেলেটি নিতান্তই একজন কিশোর। সে আমাকে দিয়ে যা বলাতে চাচ্ছে, সেটা কতটা ডেঞ্জারাস হতে পারে; বুঝতেই পারছে না!

পাঠক থেকে লেখক বেশি

বাংলাদেশে আজকাল পাঠক থেকে লেখক বেশি! যার যা খুশি এবং যেমন খুশি; লিখে ফেলতে পারছে। কোনো দায়-দায়িত্বের বালাই থাকতে হচ্ছে না। একসময় লেখা প্রকাশের ক্ষেত্র ছিল সীমিত। পত্রিকাই ছিল একমাত্র মাধ্যম। আর নতুন লেখকদের লেখাকে সম্পাদকমণ্ডলী খুব একটা পাত্তা দিতে রাজি হতেন না।

আজকাল ইন্টারনেটের কল্যাণে সুযোগ তৈরি হয়েছে। এখন আর লেখা প্রকাশের জন্য কোনো সম্পাদকের দিকে তাকিয়ে থাকতে লাগে না। 'ধরো তকতা মারো পেরেক'—স্টাইলে লিখো এবং প্রকাশ করে দাও।

সমালোচনা করছি না। এটি একটি ভালো ব্যাপার। নতুনদের অনেকেই লেখছে। লিখতে উৎসাহ পাচ্ছে। কেউ অনেক ভালো লেখছে। বেরিয়ে আসছে আগামীর লেখক। ভালো সংবাদ। নতুনদের মধ্যে যারা বই লেখছে, তাদেরকে উৎসাহিত করা উচিত। তাদের অতি আবেগি কথাবার্তা অথবা তাদের বই নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যাবার প্রচারণাকে পজিটিভলিই নেওয়া দরকার। কয়শ' কপি প্রিন্ট হলো আর বিক্রি হলো কত হাজার কপি, এই হিসাবের পেছনে যাওয়ার দরকার কী! অন্তত বলে সুখ পাক। ক্ষতি তো নেই। একসময় যখন সত্যি সত্যি হবে, তখন আর বলবে না।

চলুন নিজেরা নিজে তৈরি হই।
আত্মতৃপ্তিতে না ভোগে আত্মপ্রত্যয়ী হই।
কত আর তাদের পেছনে দৌড়াব! এখন তাঁরা দৌড়াক।
আমরা আমাদের মতো হাতে রাখি হাত আর সুর ধরি একসাথে,

বিশ্বাসের বিভাজনে আস্ফালিত অভাজন,
শূন্য উদ্যানে ঘু ঘু খেয়ে গেছো ধান,
আর না, কখনোই,
দন্ত্য-ন আ-কার...

কেউ যদি বিজ্ঞান নিয়ে একটা বই লিখে আর বইয়ের নাম দেয় 'ভূতের বাচ্চা আইনস্টাইন'! কেউ যদি দর্শন নিয়ে বই লিখে আর নাম দেয় 'হনুমানের বাচ্চা সক্রেটিস'! অবশ্যই সেটা অ্যাক্সেপ্টেবল না। কারণ, নামগুলো স্ব স্ব ক্ষেত্রে একেকটি ব্র্যান্ড হয়ে গেছে।

কোনো পণ্ডিত যদি রাজনীতি নিয়ে বই লিখে বইয়ের নাম দিয়ে দেয় *...র বাচ্চা জিয়া*, তাহলে ভাঙ্গা কোমর নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও বিএনপির লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করবে। আর কোনো কারণে এবং অকারণেই *...র বাচ্চা শেখ মুজিব* নাম দিলে তো আর হয়েছেই। লেখকের চৌদ্দগোষ্ঠীর খবর আছে।

নামে কিছুই যায় আসে না আবার অনেক কিছুই যায় আসে। তাই যে যুক্তিতে ভূতের বাচ্চা আইনস্টাইন/সক্রেটিস/জিয়া/মুজিব বলা অমার্জনীয় ধৃষ্টতা হবে, সেই যুক্তিতে; বরং তারচেও শক্তিশালী যুক্তিতে, ভূতের বাচ্চা সোলায়মান বলাটাও অমার্জনীয় ধৃষ্টতার শামিল... *পাগলের মাথা খারাপ* বইটি এই প্রেক্ষাপটেই রচিত।
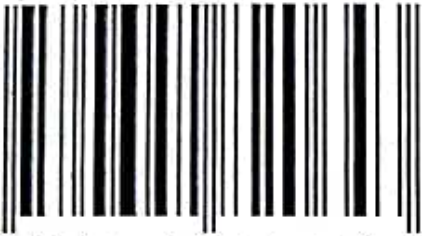
Pagoler Matha Kharap
by : **Rashid Jamil**
Kalantor Prokashoni
BD ৳ 140, US $ 5, UK £ 4
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
facebook.com/kalantorprokashoni

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফি লাইফ
বইপার্ক, রেনেসাঁ